নিয়মিত প্রকাশনার ৪২ বছর

জমাদিউস সানি

মাসিক জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরি, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি'২১

তরজুমান

এ'আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

- সরকারী খাস জায়গায় মসজিদ: শর-ঈ ফয়সালা
- সফলতার দুটিপথ: রাগ সংবরণ করা ও সঠিক পথে স্থিরতা
- মুমিনের ঘর-বাড়ি: আলোকিত ঠিকানায় সমৃদ্ধ জীবন যাপন
- কষ্ট মুমিন জীবনের একটি অধ্যায়
- বিপদ-মুসিবত উত্তরণে রাসুল এর নীতি ও আদর্শ
- বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রে ইসলামী পরিভাষা ও মুসলিম ঐতিহ্য

ওয়েস্টারমস্কি, আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক
তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUS
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: **info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org**

মাসিক

তরজুমান

৪২ তম বর্ষ □ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জমাদিউস্ সানি-১৪৪২ হিজরি
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি '২১, মাঘ-১৪২৭

সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
monthlytarjuman@gmail.com
Website: www.anjumantrust.org
www.facebook.com/monthlytarjuman

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

THE MONTHLY TARJUMAN
A.C. NO. - SB/1453010001669
RUPALI BANK LTD.
DEWAN BAZAR BRANCH
CHITTAGONG, BANGLADESH.

আন্‌জুমানের মিসকিন ফান্ড
একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫ চলতি হিসাব,
রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা, চট্টগ্রাম।

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ১০

শানে রিসালত ১২
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

বিপদ মুসিবত উত্তরণে রাসূলের নীতি ও আদর্শ ১৬
ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

কষ্ট মুমিন জীবনের একটি অধ্যায় ২১
মুহাম্মদ ওসমান গণি

মুমিনের ঘর-বাড়িঃ আলোকিত ঠিকানায় সমৃদ্ধ জীবন যাপন ২৩
মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

সফলতার দু'টি পথ: রাগ সংবরণ করা ও সঠিক পথে স্থিরতা ২৭
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও ফজিলত ৩২
মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলকাদেরী

বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রে ইসলামী পরিভাষা ও মুসলিম ঐতিহ্য ৩৬
মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার

আলো-আধারীর গোলাক ধাঁধা ৩৯
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

বৈশ্বিক মহামারীঃ করোনা ভাইরাস ৪৩
ডাঃ এএসএম শওকতুল ইসলাম শওকত

সরকারী খাস জায়গায় মসজিদ: শর'ঈ ফয়সালা ৪৮
মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

প্রশ্নোত্তর ৪৯

হযরত সিদ্দীক-ই আকবরের দৃঢ়তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ৫৫
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

সাঙ্গ হবে রঙ্গ ভবের ৫৮
হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান

ফীহি মা ফীহি মূলঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী (রহ.) ৬০
অনুবাদ: কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

স্বাস্থ্য-তথ্য ৬১

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৬৩

সম্পাদকীয়

হিজরী বর্ষের ৬ষ্ঠ মাস মাহে জমাদিউস্সানী। এ মাসে ইসলামের প্রথম খলীফা প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী খোলাফায়ে রাশেদীন’র মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারি প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন’র সুখ-দুঃখের সাথী ইসলাম’র জন্য সর্বস্বত্যাগী হযরত সৈয়্যদুনা আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু ওফাত লাভ করেন। আল-আমীন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সুযোগ্য সহযাত্রী আস্-সিদ্দিক সত্যবাদী হিসেবে উপাধি লাভ করেছিলেন। ইসলাম প্রচারের প্রথম অবস্থার কঠিন দুঃসময়ে তিনি ছিলেন প্রিয় নবীর সাথী। শয়নে-স্বপনে জাগরণে সর্বদা প্রিয় নবীর খেদমতে সমর্পিত এ মহান সাহাবীর শানে আল্লাহ্ জাল্লাহ-শানুহু পবিত্র কালামে পাকে একাধিক আয়াতে করীমা নাযিল করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর সিদ্দীক-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দ্বীন ইসলামের বাগানে এমন পরিচর্যা করেছেন, দুনিয়া যতদিন থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সেটার ফুল ও ফল দ্বারা গোটা পৃথিবীর মুসলমান উপকৃত হতে থাকবে। জান্নাত’র সুসংবাদপ্রাপ্ত এ মহান সাহাবী অন্তরের কোমল কমলীয়তায় যেমন উদার ছিলেন তেমনি, রাষ্ট্রপরিচালনায়, শরীয়তের হুকুম আহকাম রক্ষায় ছিলেন কঠোর। ২৭ মাসের খেলাফত পরিচালনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় পরবর্তী শাসকদের জন্য তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নীতির ওপর ভর করে খেলাফত পরিচালনা করা অনেক সহজসাধ্য হয়েছে। তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা যেমন সুক্ষাতিসুক্ষ ছিল, তেমন তাঁর দানশীলতা, মানবিক গুণাবলী ছিল অতুলনীয় ও সর্বজন নন্দিত। খলীফা নির্বাচিত হবার পর তিনি সর্বপ্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা চির স্মরণীয় ও রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য চির শিক্ষণীয় বিষয় এতে রয়েছে। তিনি বলেন, “আমি যদি ভাল কাজ করি, তবে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি আমি মন্দ কিংবা অন্যায় কাজ করি তবে সে সম্পর্কে অবহিত করবে। সততা হচ্ছে আমানত, মিথ্যা হচ্ছে খিয়ানত। তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল, সে আমার নিকট সবল যে পর্যন্ত না আমি তার প্রাপ্য উদ্ধার করে দিই। আর সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল যে পর্যন্ত না তার নিকট থেকে অপরের হক নিয়ে নিই।” প্রিয়নবীর দুনিয়াবী জীবনে তিনি যেমন সার্বক্ষণিক সাথী ছিলেন তেমনি কবরে হাশরে, পুলছিরাতে ও জান্নাতে আক্বা মাওলার সহযাত্রী হবেন। প্রিয় নবীর পাশেই শায়িত আছেন হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু। নবীজির চরিত্রকে সার্বিকভাবে আত্মস্থ করা এবং নবী ও ইসলামের জন্য সর্বস্বত্যাগ করার অনুপম দৃষ্টান্ত আমাদের পথ চলার পাথেয় হোক, এ হোক আমাদের অঙ্গীকার। এতেই মিলবে অন্তরাত্মার শান্তি। এই মহিমান্বিত নবী প্রেমিকের ফয়ুজাত আল্লাহ্ আমাদের নসীব করুন- আমীন।

ইংরেজী নববর্ষের শুভ আগমনকে জানাই স্বাগতম। ২০২০ সালে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে লাখ লাখ মানুষ দুর্যোগ মহামারি কোভিড-১৯ সহ অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন- অনেকে হয়েছেন আক্রান্ত। নববর্ষ ২০২১-এ এমন দুর্যোগ ও বিপদাপদ থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই। আমাদের মুক্তি কামনা করছি। আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতাগুলো সংশোধনের মাধ্যমে চরিত্রবান মানুষ হতে পারি এ প্রত্যাশা রইলো নববর্ষে। করুণাময় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র পথে পরিচালিত হয়ে নবী প্রেমিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি আগামী দিনগুলোতে। নববর্ষের শুভাগমনে প্রশান্তি নেমে আসুক সারা বিশ্বে।

তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত’র লেখক-পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী সহ সকল মুসলিম মিল্লাতের প্রতি রইলো ফুলেল শুভেচ্ছা। নববর্ষ মুসলিম বিশ্বের জন্য শুভ হোক, গৌরব, সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।

দরসে কোরআন

নবী-অলীর মহব্বতে জীবন যাপনকারীরাই সফল ও সৌভাগ্যবান

হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

তরজমা : (মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন) (তাদের অর্থাৎ বনু নুযায়রের দৃষ্টান্ত) ওই সব লোকের ন্যায়, যারা তাদের অব্যবহিত পূর্বে ছিল, তারা আপন কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি ভোগ করেছে, এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (তাদের অর্থাৎ মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত) শয়তানের মত, যখন সে মানুষকে বলল, কুফর করো, অতঃপর যখন মানুষ কুফর করেছে তখন সে (অর্থাৎ শয়তান) বললো, আমি তোমার নিকট থেকে পৃথক। আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। অতঃপর উভয়ের পরিণতি (অর্থাৎ পূর্বোক্ত ইহুদী ও মুনাফিক সম্প্রদায়ের) এ হলো যে, তারা উভয় আগুনের মধ্যে রয়েছে, তথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই জালেমদের শাস্তি। হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির দেখা উচিৎ যে, আগামীকালের জন্য (অর্থাৎ আখেরাতের জন্য) সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যাদী সম্পর্কে অবহিত আছেন। এবং তোমরা তাদের মতো হয়োনা, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই ফাসিক-অবাধ্য। জাহান্নামবাসী এবং জান্নাতবাসীগণ এক সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। [সূরা হাশর, আয়াত নং ১৫-২০]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا
وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٥) كَمَثَلِ
الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ
قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّـهَ رَبَّ
الْعَالَمِينَ (١٦) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي
النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ
الظَّالِمِينَ (١٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا
اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) وَلَا
تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنسَاهُمْ
أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١٩) لَا
يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ
الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ
الْفَائِزُونَ (٢٠)

আনুষঙ্গিক আলোচনা

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ الخ ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন-এ আয়াতের সূচনায় مثلهم শব্দটি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তাদের দৃষ্টান্ত তথা ইহুদী গোত্র বনু নুযায়রের দৃষ্টান্ত। আর الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? এর ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাফসীর বেত্তা ইমাম মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-এরা হলো বদরের যুদ্ধে নিহত মক্কার কাফের যোদ্ধা। আর মুফাসসিরকুল সরদার সাইয়্যেদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন-এরা হলো আরেক ইহুদী গোত্র বনু-কায়নুকা। উভয়েরই অশুভ পরিণতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা তখন জন সমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা, বনু-নুযায়রের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সংঘটিত হয় এবং বনু-কায়নুকার নির্বাসনের ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদর যুদ্ধে মুশরিকদের সত্তর জন নিহত হয়, সত্তরজন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং ইমাম মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলায়হির উপরোক্ত অভিমত অনুযায়ী আল্লাহর বাণী ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ۖ বাক্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। এটা পরকালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে।

দরসে কোরআন

فَكَانَ عَاقِبَتَـهُمَا أَنَّـهُمَا فِي النَّارِ الخ

উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর শাস্ত্র বিশারদগণ উল্লেখ করেছেন-পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করা ইহুদীগণ এবং আনসার-মুহাজির সাহাবীগণের সমাজে তাঁদেরই বেশভূষা ও আমল-ইবাদত অবলম্বনকারী মুনাফিক উভয়েরই পরিণতি হলো-তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়েছে। কারণ, তারা প্রকাশ্যে কাফের-মুশরিক হিসাবে পরিচিত না হলেও মক্কায় কাফের-মুশরেকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনকারী ও তাদেরকে সার্বিকভাবে সাহায্য সহযোগীতাকারী ছিল। তাই কাফের-মুশরেকদের পরিণতির ন্যায় তারাও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়েছে। জাগতিক জীবনে যার সঙ্গে যার বন্ধুত্ব-ভালবাসা ও মেলামেশা থাকবে, হাশরের ময়দানেও তার সঙ্গে তার হাশর ও অবস্থান হবে। ছহীহ বুখারী শরীফের রেওয়ায়তে রাসূলে করীম, রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-المرء مع من احب মানুষ পরকালীন জীবনে তার সঙ্গে অবস্থনকারী হবে জাগতিক জীবনে যার সঙ্গে সে ভালবাসা-বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। এ হাদীসে নববীর আলোকে পরম সৌভাগ্যবান ঐ সকল মুমিন-যারা নবী-অলীর মহব্বতে-ভক্তিতে প্রেমাসক্ত হয়ে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরন-অনুকরনে নিজেদের জীবনকে অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়েছে। (আলহামদুলিল্লাহ)

[তাফসিরে নুরুল ইরফান]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰـهَ الخ

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত তাফসিরবেত্তা ইমাম যামাখশারী তাফসীরে কাশশাফে উল্লেখ করেছেন-উদ্ধৃত আয়াতে اتَّقُوا اللّٰـهَ কে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে-কেয়ামত সংঘটিত হওয়া ও কেয়ামত পরবর্তী জীবন সম্পর্কে উদাসীন বান্দাগনকে সাবধান ও তাগিদ প্রদানের জন্য। এছাড়া আলোচ্য আয়াতে-কেয়ামতকে আগামীকাল বলে বর্ণনা করার তিনটি রহস্য বর্ণনা করছেন মুফাসসেরিনে কেরাম। প্রথমতঃ সমগ্র ইহকাল পরকালের মোকাবেলায় স্বল্প ও সীমিত। অর্থাৎ যেন এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। এই অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এই দুনিয়ার কোন তুলনাই হয় না। দ্বিতীয়ত ঃ কেয়ামত সুনিশ্চিত যেমন, আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারেনা। অনুরূপভাবে দুনিয়ার পর কেয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। তৃতীয়ত ঃ কেয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়-খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কেয়ামত ও খুব নিকটবর্তী। সার বক্তব্য হলো-আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতকে আগামীকাল বলে বর্ণনা করে উদাসীন বান্দাগণকে সতর্ক করা হয়েছে যেন কেয়ামত পরবর্তী অপরিসীম ও অনন্ত জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহে সবাই তৎপর ও ব্যস্ত হয়।

[তাফসীরে কাশশাফ শরীফ]

কোন কোন তাফসীর বিশারদ বক্ষমান আয়াতে اتَّقُوا اللّٰـهَ (অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর) অংশটি দুবার উল্লেখ করার তাৎপর্য বর্ণনা করে বলেছেন-আয়াতের প্রথম ভাগে اتَّقُوا اللّٰـهَ বলে খোদায়ী নির্দেশাবলী পালন করে পরকালের জন্য সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার اتَّقُوا اللّٰـهَ বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ করছ, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কিনা, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যতঃ সৎকর্ম, কিন্তু তা খালেসভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না, বরং তা নাম-যশ অথবা মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয়, অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যতঃ ইবাদত হলেও ধর্মে তার কোন গুরুত্ব না থাকার কারণে পথভ্রষ্টতা। সতুরাং দ্বিতীয় اتَّقُوا اللّٰـهَ বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্য কেবল দৃশ্যতঃ সম্বল যথেষ্ট নয়, বরং তা খালেস ইবাদত কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

عن ما لك بن دينار مكتوب علي باب الجنة وجدنا ما عملنا ربحنا ما قد منا خسرنا ما خلفنا অর্থাৎ আরেফে কামেল হযরত মালেক বিন দিনার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন-বেহেশতের দরজায় এ বাক্য সমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে-"আমরা আমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পেয়েছি, পূর্বে প্রেরিত সৎকর্মের দ্বারা আমরা লাভবান হয়েছি এবং আমলবিহীন অলস সময়ের কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি।" এটা যেন বেহেশতিগণের স্বীকারুক্তি। এর মাধ্যমে আল্লাহর কুরআনের বাণীর সত্যতা ও যথার্থতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো। [তাফসিরে কাশশাফ]

মহান আল্লাহর আলীশান দরবারে ফরিয়াদ তিনি যেন সকলকে উপরোক্ত দরছে কোরাআনের উপর আমল করে উভয় জাহানে সফলকাম হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করেন। আমীন।

লেখক: অধ্যক্ষ-কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা,
মুহাম্মদপুর এফ ব্লক, ঢাকা।

মাতা পিতার সাথে সদাচরণের গুরুত্ব

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ -

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ [رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ]

অনুবাদ: **হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমার সর্বোত্তম ব্যবহার পাওয়ার হকদার কে? নবীজি বললেন, তোমার মা, লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা, লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, অতঃপর কে? নবীজি বললেন তোমার মা, লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, অতঃপর কে? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার পিতা।** [সহীহ্ বুখারী, হাদীস-৫৯৭১, মুসলিম শরীফ, খন্ড-২, পৃ. ৩১২]

হযরত আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সন্তানের উপর মাতা পিতার কি হক রয়েছে? নবীজি বললেন, তারা তোমার বেহেশত ও তারা তোমার জাহান্নাম। [ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং-৩৬৬২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য হাদীস শরীফ দু'টিতে মাতা পিতার অধিকার ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মাতা পিতার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাঁদের অধিকার আদায়ের প্রতি ইসলামে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

পিতা মাতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি ভালবাসার নিদর্শনরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

- **মাতা পিতার অধিকার প্রতিষ্ঠায় আল কুরআনের নির্দেশনা**

জান্নাতের পথ সুগম করার জন্য মাতা পিতার মর্যাদা ও অধিকার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি সদাসর্বদা সচেষ্ট ও সচেতন থাকার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে-

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا(٢٣)وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا (٢٤)

অর্থঃ তোমার পালন কর্তা আদেশ করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করোনা এবং পিতা-মাতার সাথে

সদ্ব্যবহার করো, যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে উহ্ শব্দটিও বলোনা এবং তাদেরকে ধমক দিওনা। আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে এবং তাদের জন্য বিনয়ের বাহু বিছিয়ে দাও এবং বলো হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করো যেভাবে তারা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন।

[সূরা-১৭, বনী ইসরাঈল: আয়াত-২৩-২৪]

পবিত্র কুরআনে আরো এরশাদ হয়েছে-

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔـا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থঃ আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তার সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করোনা এবং পিতা মাতার প্রতি উত্তম আচরণ করো। [সূরা- নিসা, আয়াত-৩৬]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে প্রায় পনের স্থানে আল্লাহর হক বর্ণনা করার সাথে পিতা মাতার প্রতি সদাচরণ করা, শিষ্ঠাচারপূর্ণ উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাতা পিতার সেবা ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের পথ সুগম করে দিয়েছেন।

• মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত

একদা এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই। আপনার পরামর্শের জন্য উপস্থিত হয়েছি, নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছে? লোকটি উত্তর দিলেন হ্যাঁ, নবীজি এরশাদ করেন-

قَالَ فَالْزِمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا

তোমার মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকো, যেহেতু জান্নাত তার কদমের নীচে। [মিশকাত শরীফ, পৃ.-২৪১]

• পিতা মাতার অবাধ্য সন্তানের প্রতি নবীজির অসন্তুষ্টি

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ
وَالِدَيْهِ مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ

অর্থ: যে ব্যক্তি মাতা পিতাকে কষ্ট দেয়, সে অভিশপ্ত। যে ব্যক্তি মাতা পিতাকে কষ্ট দেয়, সে অভিশপ্ত, যে ব্যক্তি মাতা পিতাকে কষ্ট দেয়, সে অভিশপ্ত।

[ফাতওয়ায়ে রজভীয়া, খন্ড-১০ম, পৃ. ৩৯৪, কৃত. ইমাম আহমদ রেযা]

পিতা মাতাকে কষ্টদানকারী কোন ব্যক্তির ফরজ, নফল ও অন্য কোন প্রকার আমল আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন না। [ফাতাওয়ায়ে রজভীয়্যাহ্, খন্ড-১০ম, পৃ. ৫৮]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন,

رِضَى الرَّبِّ فِيْ اللوالد وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخط اللوالد

অর্থঃ পিতা মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। পিতা মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। [মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪১৯]

• হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনা

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন যে, সাহাবী হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবীজির দরবারে স্বীয় পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলেন যে, আমার সন্তান অধিক পরিমাণে ইবাদত-বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকেন, সারা রাত বিনিদ্র রজনী যাপন করে ইবাদত করে ও দিনের বেলায় রোজা পালন করে ইবাদত রিয়াজতের কারণে আমার খিদমত সেবা করার সুযোগ কম পায়, তখন নবীজি এরশাদ করেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতা মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

[আশিয়াতুল লুমআত, খন্ড-৪, পৃ. ১০৫, আনোয়ারুল বয়ান, খন্ড-২, পৃ. ৬১]

• পিতা মাতার খিদমত করলে রিযিক বৃদ্ধি পায়

রসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَمُرَّ لَهُ فِيْ عُمْرِهٖ وَيُزَادُ فِيْ رِزْقِهٖ فَلْيَبِرَّ
وَالِدَيْهِ وَلِيَصِلْ رِحْمَهُ

অর্থ: যে পছন্দ করে যে, সে দীর্ঘজীবী হউক, তার রিযিক বৃদ্ধি হউক, সে যেন পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করে, ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।

[কাশফুল গুম্মাহ্, পৃ. ২৬, মিশকাত শরীফ, পৃ. ২২১, হুকুকে ওয়ালেদাঈন, পৃ. ১৭, কৃত. ইমাম আহমদ রেযা]

• তিন শ্রেণির বান্দার দুআ ফেরত হয় না

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তিন শ্রেণির মানুষের দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এক. মজলুমের দুআ. ২. মুসাফিরের দুআ, ৩. পিতা মাতার দুআ সন্তানের জন্য।

[তিরমিযী শরীফ, খন্ড-২, পৃ. ১৩]

দরসে হাদীস

• পিতা মাতাকে কষ্টদানকারী দুনিয়াতেই তার শাস্তি

عَنْ اَبِىْ بَكرة رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذوب يَغْفِرُ اللهُ مِنْهَا مَاشَاءَ اِلاَّ عُقُوْقُ اللوَالِدِيْن فَاِنَّه يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ [رواه البيهقى]

অর্থ: হযরত আবু বাকরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মাতা পিতার অবাধ্যতা ছাড়া অন্য যে সকল গুনাহ রয়েছে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে তা থেকে ক্ষমা করে দেন কিন্তু মাতা পিতার অবাধ্যকে আল্লাহ্ মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। [বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪২১]

• অন্যের পিতা মাতাকে গালমন্দ করা নিজের পিতা মাতাকে গালি দেওয়ার নামান্তর

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি পিতা মাতাকে গালমন্দ করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, কোনো ব্যক্তি কি তার পিতা মাতাকে গালমন্দ করে? নবীজি বললেন,

نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ يَسُبُّ اَبَاهُ وَيَشْتم اُمُّهُ فيشتم امه

অর্থ: একজন অপরজনের পিতামাতাকে গালি দেয়, তখন সেও ওই লোকের পিতামাতাকে গালমন্দ করে।

[বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃ. ৮৮৩]

• মাতার উপর স্ত্রীকে প্রাধান্য দেওয়া মারাত্মক গুনাহ্

লোকেরা নিজের স্ত্রীর প্ররোচনায় নিজ পিতা মাতাকে গালমন্দ করে এমনকি শারীরিক নির্যাতন করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয় অথবা তাঁদেরকে একাকী পরিত্যাগ করে স্ত্রী পুত্র নিয়ে আনন্দে বসবাস করে এমন সন্তানের জন্য বড়ই পরিতাপ। নবীজি এরশাদ করেছেন,

مَنْ فَضِّلَ زَوْجَتُهُ عَلٰى اُمِّهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللهُ
وَمَلٰئِكَتِهِ وَالنَّاس اَجْمَعِيْنَ

অর্থ: যে ব্যক্তি নিজ মাতার উপর স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দেয় তার উপর আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের ও সকল মুমীনের লানত। [আনোয়ারুল বয়ান: খন্ড-২, পৃ. ৬৯]

• মাতা পিতার বন্ধু-বান্ধবীর সাথে সদাচরণ করা

এক আনসারী সাহাবী নবীজির খিদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পিতা মাতার ইন্তেকালের পর তাদের প্রতি সদাচরণ করার কোন উপায় আছে কি? নবীজি এরশাদ করেন, হ্যাঁ চারটি উপায় আছে।

এক. তাদের জানাযা পড়া, দুই. তাদের মাগফিরাত কামনা করা, তিন. তাদের ওসীয়ত পূর্ণ করা, চার. তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাঁদের প্রতি সদাচরণ করা।

[আবু দাউদ শরীফ, হুকুকে ওয়ালেদাঈন, কৃত. ইমাম আহমদ রেযা]

• মাতা পিতার চেহারা মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখার সওয়াব

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, পিতা মাতার প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখলে মকবুল হজ্বের সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। [মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪২১]

• মায়ের কদম চুম্বন করার ফযীলত

বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী হাদীস বর্ণনা করেছেন, একদা এক ব্যক্তি নবীজির দরবারে আরজ করলেন যে, আমি এ মর্মে মান্নত করেছি যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাতে মক্কা মোকাররমার বিজয় দান করেন, আমি কাবা শরীফের চৌকাট চুম্বন করবো। নবীজি বললেন,

فَقَالَ قَبِّلْ قَدْمَىْ اُمُّكَ وَقَدْ وَفَيْتَ نَدْرُكُ

অর্থ: তুমি তোমার মায়ের দু কদমে চুম্বন করো, এতে তোমার মান্নত পূর্ণ হয়ে যাবে। [উমদাতুল কারী, খন্ড-২, পৃ. ৮২]

• পিতা মাতার পক্ষ থেকে নফল নামায পড়া

যখন নিজের জন্য নফল নামায পড়েন কিছু নফল নামায তাদের পক্ষ থেকেও পড়ুন তাঁদের রুহে সওয়াব পৌঁছিয়ে দিন। তাঁরাও সওয়াব পাবেন আপনার সওয়াবেও সামান্যতম হ্রাস পাবে না। [হুকুকে ওয়ালেদাঈন, কৃত. ইমাম আহমদ রেযা]

• পিতা মাতার কবর জিয়ারত

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পিতা মাতা দু'জনের বা একজনের কবরে জুমাবার দিবসে যিয়ারত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্ ক্ষমা করবেন। তার নাম নেক্কার হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে। [তিরমিযী শরীফ, মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৫৪]

নবীজি আরো এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি জুমাবারে পিতা মাতা দু'জনের বা একজনের কবর যিয়ারত করবে সূরা ইয়াসিন শরীফ তিলাওয়াত করবে, এতে যতটি অক্ষর

রয়েছে তার গণনার সম পরিমাণ গুনাহ্ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। [ফাতাওয়ায়ে রজভীয়্যাহ্, খন্ড-১০ম, পৃ. ১৯৪]

• পিতা মাতা অমুসলিম হলেও সদাচরণ করো

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِیْ بَكَرٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدَمَتْ عَلَیَّ اُمِّیْ وَهِیَ مُشْرِكَةٌ فِیْ عَهْدِ قُرَیْشٍ فَقُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اُمِّیْ قَدَمَتْ عَلَّی وَهِیَ رَاغِبَةٌ اَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صَلِّیْهَا [رَواه البخاری]

অর্থ: হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে আসলেন, তিনি ছিলেন (মুশরিকা) (অমুসলিম) এ ঘটনা তখনকার যখন কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা আমার কাছে এসেছেন অথচ তিনি ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট। সুতরাং আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবো? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তার সাথে উত্তম আচরণ করো।

[বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃ. ৮৮২]

ইসলামী আদর্শ কতই উৎকৃষ্ট, উত্তম ও মানবিক। মাতা পিতা অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও উত্তম মানবিক আচরণের এমন নির্দেশনা অন্য কোন জীবনাদর্শে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল সৃষ্টির প্রতি সেবা ও মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে ইসলামের আদর্শ অনন্য ও সমুজ্জ্বল। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কথায় কর্মে আচরণে ব্যবহারে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শ নসীব করুন। পিতা মাতার প্রতি সম্মান সদাচরণ ও তাদের সকল প্রকার অধিকারের প্রতি সচেতন থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : অধ্যক্ষ, মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, মধ্য হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।

জমাদিউস্ সানী

হিজরী বর্ষের ষষ্ঠ মাস 'জমাদিউস্সানী' সমাগত। এ মাসের প্রকৃত নাম জুমাদাল উখরা। আরবীতে জুমাদা মানে স্থির ও জমাট বাঁধা পাথর। যখন এ মাসের নামকরণ করা হচ্ছিল তখন সেখানে পানি বরফ হয়ে জমাট বাঁধার শেষ মাস ছিল। এ কারণে এর নাম জুমাদাল উখরা রাখা হয়েছে। হিজরীবর্ষেও এ নামটি বহাল রাখা হয়েছে। বর্ষপঞ্জীর পাতায় অর্ধাংশ উপনীত হয়ে জীবন ও মৃত্যু, ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে সচেতন মানুষ মাত্র অতীতের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে মৃত্যু ও পরকালের জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে রসদ সংগ্রহের কাজে মনোযোগ নিবন্ধ করবেন। মনে রাখা উচিত, সময় কারো জন্যই বসে থাকেনা। সময় নদীর স্রোতের মতই চলছে ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য। এ সময় যারা হেলায় অতিবাহিত করবে, তাদের জন্য আফসোস ছাড়া কোন উপায় থাকেনা।

এ মাসের নফল ইবাদত

প্রথম তারিখের ১ম রাতে ৪ রাকাত নফল নামায যদি এভাবে পড়া হয়- প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১৩ বার সূরা ইখলাস পড়বে, এ নামায সম্পন্নকারীর আমলনামায় ১ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ হয় ও ১লক্ষ গুনাহ্ মুছে ফেলা হয়।

১ম তারিখের ১ম সন্ধ্যায় বা'দ মাগরীব ১২ রাক'আত নামায হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আদায় করতেন বলে বর্ণিত আছে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস এগার বার এবং তিন বার আয়াতুল কুরসী দ্বারা এ নামায আদায় করতেন।

১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে দুই রাকাত বিশিষ্ট ১২ রাকাত নামায আদায় করতে পারেন। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে পনের বার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। এ নামায আদায়কারীর সগীরা গুনাহ সমূহ মার্জনা করা হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা নসীব হবে।

এ মাসের ২০ তারিখের পর হতে অবশিষ্ট দিনগুলি নফল রোজা রেখে প্রতি রাতে ২০ রাকাত করে নামায আদায় করা সাহাবায়ে কেরামের আমলের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা মাহে রজবকে স্বাগত জানানোর নিয়্যতে এ আমল করতেন। নামাযের পর নিম্নের দোয়াটি ১০০ বার পাঠ করলে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের সকল প্রকার অশান্তি হতে মুক্ত থাকবে।

এ ছাড়া দোয়াটি প্রত্যহ ফজর ও মাগরীব নামাযের পর ১০০ বার পাঠ করলে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সকল প্রকার অশান্তি হতে মুক্ত থাকবে, **'হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ূমু ওয়া হুয়াল গনিইয়ুল মাতীন।'**

এ মাসে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হওয়া সাফল্য আসার পূর্বাভাস। অর্থাৎ ফসল বেশি জন্মাবে, দ্রব্যমূল্য কমবে, নি'মাতের ছড়াছড়ি হবে।

এ মাসের স্মরণীয় ঘটনাবলী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম সর্ব প্রথম আগমন করেন এ মাসের ১ তারিখ। এ মাসের ৬ তারিখে হযরত ওমর ফারূক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। এ মাসের ১৪ তারিখ হযরত মূসা ইবনে জা'ফর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং ২০ তারিখ হযরত ফাতিমাতুয্ যাহ্রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা'র জন্ম। ৮০ হিজরির এ মাসে হযরত ইমাম আবূ হানীফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বরকতময় জন্ম হয়।

৪ হিজরির এ মাসে প্রসিদ্ধ 'ইফক'-এ ঘটনা সংঘটিত হয়। যার উপর ভিত্তি করে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বার পবিত্রতা ও প্রশংসায় পবিত্র ক্বোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং অপবাদের শাস্তির বিধানও এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তায়াম্মুমের বিধানও এ ঘটনার সময় এসেছিল।

এ মাসের ১৫ তারিখ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কা'বাহ্-ই মু'আয্যমাকে নতুনভাবে নির্মাণ করে সেটাকে ওই কাঠামোতে নিয়ে আসেন যা সাইয়্যিদুনা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম'র পবিত্র যুগে ছিল।

৪৮ হিজরিতে এ মাসেই হযরত আমীর-ই মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তণ করেন।

১৭ হিজরিতে এ মাসেই মসজিদ-ই নববী শরীফকে প্রথমবার প্রশস্ত করা হয়।

এ মাসে যাঁরা ওফাত লাভ করেন

১ জমাদিউস্ সানী: হযরত আবু আহমদ আবদাল চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। (৭৫৫ হিজরী)

৫ জমাদিউস্ সানী: আল্লামা জালালুদ্দীন রূমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। (৬৭২ হিজরী) মসনবী শরীফের প্রণেতা।

১৪ জমাদিউস্ সানী: ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (৫০৫ হি.)।

২২ জমাদিউস্ সানী : হযরত আবু বকর সিদ্দীক রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। (হিজরী ১৩ সাল)

২৫ জমাদিউস্ সানী: হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। (১০১২ হিজরী)

আগামী চাঁদ : মাহে রজব

সম্মানিত মাস সমূহের অন্যতম এবং 'আল্লাহর মাস' রূপে আখ্যায়িত রজব মাস। আল্লাহর রহমত, করুণা ও দয়া লাভের এ মাসে মহিমান্বিত লাইলাতুল মে'রাজ, লায়লাতুর রাগায়িব ও লাইলাতুল ইস্তিফতাহ্, রাতে ইবাদত বন্দেগী করে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের মহা সুযোগ আনয়ন করে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র বর্ণনানুযায়ী রজব মাসের চাঁদ দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মোবারক হাতদ্বয় তুলে দোয়া করতেন -

'আল্লাহুম্মা বারিক্লানা ফী রজবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগনা রমদ্বান'।

লায়লাতুর রাগায়িব (এ মাসের সর্ব প্রথম শুক্রবারের পূর্ব রাত) দুই রাকাত করে ১২ রাকাত নামায আদায় করতে ভুলবেন না। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে তিনবার সূরা ক্বদর (ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল্ ক্বদ্‌র) ও ১২ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। নামায শেষ করে ৭০ বার দরূদ শরীফ পড়ে সাজদায় পতিত হয়ে **'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ'** এ দোয়াটি ৭০ বার পড়ে মাথা উঠিয়ে আরো ৭০ বার দোয়াটি পড়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করবেন।

এ মাসের ১৫ তারিখ রাত (লাইলাতুল ইস্তিফতাহ) নফল নামায পড়ে কাটানো আল্লাহর করুণা লাভের কারণ হবে। বিশেষতঃ সূরা ফাতিহার সাথে তিন বার সূরা ইখলাস দ্বারা দুই রাকাত বিশিষ্ট ৭০ রাকাত নামায আদায়ে অশেষ সাওয়াব নিহিত রয়েছে।

এ মাসের ২৭ তারিখ রাতে (লাইলাতুল মে'রাজ) ইবাদতে অতিবাহিত করার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি ১২ রাকাত নফল নামায আদায় করে অতঃপর দোয়ায়ে ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ) ১০০ বার, কালেমায়ে তামজীদ ১০০ বার ও ১০০ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থণা করবে, তার দোয়া কবূল হবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ রাতে ইবাদত করে পরের দিন রোজা রাখে তাঁর আমল নামায় ১০০ বছর ইবাদতের সাওয়াব লিখা হবে।

প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

না'তে রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মৌখিক জিহাদের উত্তম হাতিয়ার

হুযূর-ই আকরাম, সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা আনসারকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন, যেসব লোক আল্লাহর রসূলের সাহায্য সম্পদ ও হাতিয়ার দ্বারা করেছে, তাদের জন্য কোন্ জিনিষ বাধ সেধেছে তাদের মুখেও রসূলের সাহায্য করতে? হযরত হাস্‌সান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এটা এরশাদ করার সময় শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি আরয করলেন, “এয়া রসূলাল্লাহ্! সেটার যিম্মাদারী আমি নিচ্ছি।” সুতরাং আজ ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে যে, তিনি নিজে নিজেকে এ গুরু দায়িত্ব পালনের যথার্থ উপযোগী বলে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। আর গোটা জীবনটুকু হুযূর-ই আকরামের প্রশংসা এবং উচ্চাঙ্গের কবিতার মাধ্যমে হুযূর-ই আকরামের বিরোধীদের এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের খণ্ডনে অতিবাহিত করেছেন।

এখন দেখুন এর ফলে দরবারে রিসালতে তাঁর মর্যাদা কত বৃদ্ধি পেয়েছে

হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সর্বাপেক্ষা বড় স্বাতন্ত্র্য এই যে, তিনি দরবারে রিসালতের শা'ইর (কবি) ছিলেন। আর তিনি রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের খণ্ডনে শে'র আবৃত্তি করতেন। তিনি একদা মসজিদে নবভী শরীফে শে'র পড়ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিষেধ করতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, “আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনার চেয়ে উত্তম সত্তার সামনে শে'র পড়তাম?” অর্থাৎ রসূলে-ই আকরামের সামনে।

হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত মদীনা মুনাওয়ারার আনসারের গোত্র খাযরাজের লোক ছিলেন। তাঁর পিতৃপুরুষগণ তাঁদের গোত্রের সরদার ছিলেন। তাঁরা সবাই দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন। খোদ হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিতের বয়স ১২০ বছর ছিলো।

হযরত হাস্‌সান বার্দ্ধক্যে ঈমান আনেন। হিজরতের কালে তাঁর বয়স ৬০ বছর ছিলো। হযরত হাস্‌সানের জীবনীতে কবিত্বের একটি বিশেষ অধ্যায় রয়েছে। তিনি তা দ্বারা এক মহান মুজাহিদ সুলভ অবদান রেখে গেছেন। উল্লেখ্য যে, কবিতা রচনা ও আবৃত্তি এবং কথা শিল্প আরবের বিশেষ লোকদের বিশেষ রুচিবোধই ছিলো। কোন কোন গোত্র তো কবিদের খনিই ছিলো। আবার ওইসব গোত্রের কয়েকটা বিশেষ খান্দান ছিলো, যাদের নিকট শা'ইরী (কবিত্ব) তাঁদের বাপ-দাদা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিলো। হযরত হাস্‌সানও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর দাদা, পিতা, তিনি নিজে, তাঁর পুত্র আবদুর রহমান এবং পৌত্র প্রত্যেকেই প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

আরবের তামাদ্দুন তথা সভ্যতার সুবহে সাদিক্ব তো আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা এবং ক্বোরআন মজীদ থেকেই উদিত হয়েছে। ক্বোরআন-ই করীম ফাসাহাত ও বলাগত (আরবী অলংকার শাস্ত্র)-এর সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা। বড় বড় কথা সাহিত্যিকদেরকে সেটার সামনে নিশ্চুপ-নির্বাক করে ছেড়েছিলো। এতদ্ ভিত্তিতে যারা ইসলামী কাব্যে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের মধ্যেও ফাসাহাত ও বলাগত (আরবী অলংকার শাস্ত্র)-এর এক নতুন প্রাণ ও আত্মার সঞ্চার হয়েছে। হযরত হাস্‌সান তাঁদের সবার থেকে এগিয়ে গিয়ে ছিলেন। হযরত হাস্‌সান যখন প্রতিরক্ষা ও খন্ডন মূলক কবিতা পড়তেন, তখন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খুব খুশী হতেন। একদা হুযূর-ই আকরাম নির্দেশ দিলেন, “হে হাস্‌সান! তুমি আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও (খণ্ডন করো), খোদা তা'আলা রূহুল কুদুস (হযরত জিব্রাঈল) দ্বারা তোমাকে সাহায্য করবেন।”

তীর ও ধারাল ছোরা

মুশরিকদের উপর ওইসব শে'রের যে প্রভাব পড়তো, সেটাকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন- “হাস্‌সানের কবিতাগুলোর প্রভাব তেমনিভাবে পড়ে, যেমন তীর ও ধারাল ছোরার প্রভাব পড়ে থাকে।”

হযরত হাস্‌সান হুযূর-ই আকরামের প্রশংসায়ও কবিতা রচনা করেছেন। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে তিনি যেসব প্রশংসামূলক

কবিতা লিখেছেন সেগুলো ছিলো অতুলনীয়। সেগুলোর প্রতিটি পংক্তি মুর্চ্ছনার মুখনিসৃত প্রতিকৃতি ছিলো। এক প্রাচীন অনুশীলনের কবি, এক বায়োপ্রাপ্ত বুযুর্গ, সর্বোপরি একজন পবিত্র সাহাবী অনুসারে হযরত হাস্সানের কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু শিক্ষা ও উপদেশ এবং উচুঁ মানের চরিত্রের দিকে মুসলিম জাতির মধ্যে আগ্রহের উদ্রেক করে।

হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত সরকার-ই দু'আলমের না'ত বা প্রশংসায় এত বড় সম্মান অর্জন করেছেন যে, খোদ্ হুযূর-ই আকরাম মসজিদে নবভী শরীফে তাঁর জন্য মিম্বর বিছিয়ে দিয়েছেন। আর হযরত হাস্সান ইবনে সাবিতকে সেটার উপর দাঁড় করিয়ে তাঁর কবিতাগুলো (আশ্'আর) শুনেছেন।

হযরত হাস্সান ইসলাম বিরোধীদের অশোভন আক্রমনের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। ৫৪ হিজরীতে রসূল-ই পাকের দরবারের এ শীর্ষস্থানীয় কবি, সাহাবী ও না'ত খাঁ ওফাত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর প্রকৃত স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে যান। মদীনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাক্বী'তে দাফন হন। ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলায়হি রাজিঊন।

দিওয়ান-ই হাস্সান

হযরত হাস্সানের অমূল্য শে'রগুলো দীর্ঘকাল যাবৎ লোকজনের মুখে মুখে এবং বক্ষগুলোতো সংরক্ষিত ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে, সেগুলো গ্রন্থাকারে একত্রে সংকলিত হয়েছে। আবূ সা'ঈদ সেগুলোকে সংকলন করে সেগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর পরে অন্য একজন লোকও সেগুলোর ব্যাখ্যা লিখেছেন। তাঁর কবিতাগ্রন্থ (দিওয়ান-ই হাস্সান) ভারত ও তিউনিসিয়ায় মুদ্রিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, তাঁর কবিত্বের মধ্যে সব ধরনের কথা, যেমন প্রশংসা, খন্ডন, ক্বাসীদাহ্, গযল, শোকগাঁথা, সর্বোপরি না'ত ইত্যাদি মওজুদ রয়েছে। কিন্তু সরওয়ার-ই কা-ইনাত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন, তাঁর সব দিওয়ানে, সেগুলোর তুলনা নেই।

ইমাম বূ-সীরী ও কসীদাহ্ বোর্দাহ্ শরীফ

প্রসিদ্ধ 'ক্বসীদাহ্ বোর্দাহ্' শরীফের সম্মানিত রচয়িতা আল্লামা শরফ উদ্দীন মুহাম্মদ বূ-সীরী মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মিশরের এক গ্রাম/নগরী বূ-সীরের মহান সর্দার ও জ্ঞান সমুদ্র আলিম, ফাসাহাত ও বলাগত (আরবী অলংকার শাস্ত্রের এমন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁর যুগে তিনিই তাঁর উপমা ছিলেন। তাঁর যুগের আলিমদের মধ্যে তিনি এক প্রখ্যাত আদীব (সাহিত্যিক) ছিলেন।

প্রাথমিক বয়সে তিনি তার খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা ও জ্ঞান গভীরতার কারণে ইসলামী সুলতান (রাজা-বাদশাহ্)দের নৈকট্য ধন্য ও প্রিয়ভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুলতানগণ ও তাঁদের আমীর উমারার প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তিতে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করতেন। আর তাঁদের শত্রুদের খণ্ডনে ক্বসীদা (কবিতাগুচ্ছ) রচনা ও আবৃত্তি করতেন।

একদিন তিনি বাদশাহ্র দরবার থেকে তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি আল্লামা বূ-সীরীকে জিজ্ঞাসা করলেন- আপনি কি কখনো হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন? স্বপ্নযোগে হুযূর-ই আকরামের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন? তিনি জবাবে বললেন, "আজ পর্যন্ত আমি হুযূর-ই আকরামের সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হইনি।" আল্লামা বূ-সীরী বলেছেন, " এ জবাব দেওয়ার পর থেকে আমার অন্তরে হুযূর-ই আকরামের ইশ্ক্ব ও মুহাব্বত-এর প্রেরণা এমনভাবে ঢেউ খেললো যে, আমার হৃদয় ওই ভালবাসা ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করতে পারছিলো না। ঘরে এসে ওই অস্থিরতা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ওই রাতেই আমি আপাদমস্তক শোভা মাহবূবে দু'-আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত (সাক্ষাৎ) লাভ করে ধন্য হলাম। আমি হুযূর-ই আন্ওয়ারকে সাহাবা-ই কেরামের জমা'আতে এমন শান-শওকতের সাথে দেখলাম যেন অনেকগুলো তারার মধ্যখানে চন্দ্র।"

চোখ খুললে আমি আমার হৃদয়কে ওই নূরানী সত্তার ভালবাসায় এবং তাঁর বরকতময় সাক্ষাতের আনন্দে ভরপুর পেলাম। এর পর থেকে একটা মুহূর্তের জন্যও সশরীর নূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা আমার নিকট থেকে পৃথক হয়নি। আর আমি এ ভালবাসা ও আনন্দের মধ্যে কয়েকটা ক্বসীদা লিখে ফেললাম। 'ক্বসীদাহ্-ই মুদ্বারিয়াহ্' ও 'ক্বসীদাহ্-ই হামাযিয়াহ্' ওই সময়েই রচিত।

এরপর একদিন হঠাৎ আমাকে অর্দ্ধাঙ্গ রোগ পেয়ে বসলো। আর আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ অনুভূতিহীন হয়ে গেলো। এ মুসীবতের সময়ে আমার হৃদয়াত্মা আমাকে পরামর্শ দিলো

যেন আমি একটি 'ক্বসীদাহ্' হুযূর-ই আকরামের প্রশংসায় রচনা করি। আর সেটার মাধ্যমে আরোগ্যের ওই মূল ফটক (باب الشفاء)-এর মহান দরবারে আমার শেফার জন্য দরখাস্ত পেশ করি। সুতরাং ওই অবস্থায়ই আমি এ ক্বসীদাহ্-ই মুবারকাহ্ (ক্বসীদাহ্-ই বোর্দাহ্ শরীফ) রচনা করেছি।

রচনা শেষে যখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, তখন স্বপ্নে ওই মসীহে কাওনাঈন, শিফা-ই দারাঈন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ (দিদার) পেয়ে আবারো ধন্য হলাম। ওই স্বপ্নেই আমি এ ক্বসীদাহ্ হুযূর-ই আকরামের সামনে পড়লাম। ক্বসীদাহ্ পাঠ শেষ করার পর দেখলাম সরকার-ই দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার শরীরের অসুস্থ অংশের উপর নূরানী হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। যখন আমার চোখ খুললো, তখন দেখলাম আমি পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছি।

এ খুশীতে আমি ভোরে ঘর থেকে বের হয়েছি। পথিমধ্যে শায়খ আবুর রাজা আস্‌সিদ্দীক্বের সাথে সাক্ষাৎ হলো। যিনি তাঁর যুগের ক্বুত্বুবুল আক্বতাব ছিলেন। তিনি আমাকে বলতে লাগলেন, ''হে ইমাম, আমাকে ওই ক্বসীদা শুনিয়ে দিন, যা আপনি হুযূর-ই আকরামের প্রশংসায় লিখেছেন।'' যেহেতু ওই ক্বসীদা শরীফ সম্পর্কে আমি ব্যতীত কেউ জানতেন না, সেহেতু আমি আরয করলাম, ''হযরত! আপনি কোন্ ক্বসীদাহ্ চাচ্ছেন, যা আমি হুযূর-ই আকরামের প্রশংসায় রচনা করেছি?''

শায়খ আবুর রাজা বললেন, ''ওই ক্বসীদাহ্ শুনান, যার প্রারম্ভ এ পংক্তি দ্বারা করা হয়েছে-

اَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِىْ سَلَمِ
مَزَجْتَ دَمْعًا جَرٰى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ

আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে আরয করলাম, ''হে আবুর রাজা! আপনি এ পংক্তিটুকু কোত্থেকে মুখস্ত করলেন, আমি তো এ ক্বসীদা আমার সরকার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কাউকে এ পর্যন্ত শুনাইনি? এ পর্যন্ত আমার নিকট এমন কেউ আসেওনি, যাকে আমি এ ক্বসীদাহ্ শুনিয়েছি।'' হযরত আবুর রাজা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, ''এ ক্বসীদাহ্ গত রাতে আমি ওই সময়ে শুনেছি, যখন আপনি রসূলে আকরামের পবিত্র দরবারে আরয করছিলেন। আর হুযূর-ই আকরামও এ ক্বসীদাহ্ শুনে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।''

ইমাম বূ-সীরী বলেছেন, ''এ কথা শুনে আমি তাৎক্ষণিকভাবে ওই ক্বসীদাহ্ তাঁর খিদমতে পেশ করলাম। এর সাথে সাথে ওই খবর গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। 'আশ্-শাওয়ারিদুল ফরদাহ্'র লেখক মহোদয় এর সাথে এও বৃদ্ধি করেছেন যে, ক্রমশ: এ খবর মালিকুয্ যাহিরের উজির বাহাউদ্দীন পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি ওই ক্বসীদাহ্ শরীফের কপি সংগ্রহ করলেন। আর প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি প্রতিদিন এ ক্বসীদাহ্ মুবারক খোলা পায়ে খোলা মাথায় দাঁড়িয়ে পড়িয়ে শুনবেন। সুতরাং তিনি তাই করলেন। ফলে তাঁর দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক কাজ পূর্ণ হলো, অনেক মুসীবৎ দূরীভূত হলো।

এরপর ওই উজিরের ফরমান লিখক সা'দ উদ্দীন ফারুক্বীর চোখ দু'টি অসুস্থ হয়ে গেলো। এমনকি চোখের জ্যোতি চলে যাবার আশংকা করলেন। স্বপ্নে তাঁকে কেউ বললো, ''বাহাউদ্দীন থেকে ক্বসীদাহ্ বোর্দাহ্' নিয়ে তোমার চোখে লাগাও!'' তিনি তাঁর নিকট গেলেন এবং স্বপ্নের কথা বললেন। বাহাউদ্দীন (উজির) বললেন, ''বোর্দার কথা তো জানি না, অবশ্য হুযূর-ই আকরামের একটি প্রশংসা গাথাঁ (ক্বসীদাহ্) আমার নিকট আছে, যা রোগ-ব্যাধির শেফার জন্য অত্যন্ত উপকারী।'' সুতরাং সা'দ উদ্দীন ওই ক্বসীদাহ্ নিলেন এবং চোখে লাগালেন এবং পড়লেন। সাথে সাথে আরোগ্য লাভ করলেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা বূ-সীরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি উজির বাহাউদ্দীনের সমকালীন ছিলেন। উজির বাহাউদ্দীন ৫৮১ হিজরী সালের অভ্যন্তরে মক্কা নগরীর পার্শ্ববর্তী ওয়াদী-ই নাখলায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ৬৭৭ হিজরীতে মিশরের কায়রোতে ইনতিকাল করেছেন। উজির বাহাউদ্দীন নিজেও একজন ভাল কবি ছিলেন। ইমাম বূ-সীরী আলায়হির রাহমাহ্ ৬৯৪ হিজরীতে ওফাত পান।

ক্বসীদাহ্ বোর্দাহ্‌র নামকরণ

১. 'বোর্দাহ্' বলা হয় বিভিন্ন রংয়ের রেখা বিশিষ্ট্য কাপড়কে। যেহেতু এ ক্বসীদাক্বেও ইমাম বূ-সীরী বিভিন্ন বিষয়বস্তু দ্বারা সাজিয়েছেন, সেহেতু এ ক্বসীদাকে ক্বসীদাহ্-ই বোর্দাহ্ বলা হয়।

২. কেউ কেউ বলেছেন, বোর্দাহ্ 'বরদুন' থেকে গৃহীত। এর অর্থ শৈথিল্য ও সোজা করা ইত্যাদি। যেহেতু কবি তাঁর এ কবিতাকে অমূলক ও অপ্রয়োজনীয় কোন কিছু দ্বারা

সজ্জিত করেননি, বরং তা পাঠ করলে হৃদয় ঠাণ্ডা হয়ে যায়, পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়, সেহেতু সেটাকে 'ক্বসীদাহ্-ই বোর্দাহ্ বলা হয়।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, 'যখন এ ক্বসীদাহ্ স্বপ্নে ইমাম বূ-সীরী আলায়হির রাহমাহ হুযূর আকরামকে পড়ে শুনিয়ে ছিলেন, তখন হুযূর-ই আকরাম নিজের 'বুর্দে ইয়ামানী' (ইয়ামনী চাদর শরীফ) তাঁর শরীরের উপর রেখে দিলেন। আর তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। সুতরাং ওই ক্বসীদাহ্ও 'ক্বসীদাহ্-ই বোর্দাহ্' হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো।

তাছাড়া, শায়খ মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মোস্তফা, ওরফে শায়খ যাদাহ্'র ব্যাখ্যাগ্রন্থেও এমনটি লিখা হয়েছে। মোটকথা, ইমাম বূ-সীরীকে হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ ক্বসীদাহ্র জন্য তাঁর দেহে নূরানী হাত বুলিয়ে আপন চাদর শরীফ 'বুর্দে ইয়ামানী' দান করেছিলেন এবং এসবের বরকতে তিনি পূর্ণ সুস্থতা লাভ করেছিলেন, ঘটনার বাস্তবতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাদির ভিত্তিতে এ ক্বসীদাহ্ 'ক্বসীদাহ্-ই বোর্দাহ্' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। সর্বোপরি একথাও প্রতীয়মান হয় যে, অকৃত্রিম ইশ্ক্বে রসূল ও রসূলে পাকের প্রশংসা (না'ত) শরীফের বরকতে আল্লাহ্-রসূলের সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং নানাবিধ বালা-মুসীবৎ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

মহাপরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

বিপদ-মুসিবত উত্তরণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নীতি ও আদর্শ

ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

উপক্রমনিকা

আমাদের জীবনটা বড্ড সমস্যা সংকুল। এ জীবনে কখনো যদি আমাদের সামনে বিপদ-মুসিবতের ঢালি নিয়ে হাজির হয়, তখনি আমরা ভেঙ্গে পড়ি। ভেতরে ভেতরে গুঁড়িয়ে যাই। অথচ জীবনটা তো এমনই। বহতা নদীর স্রোতের মতো জীবনের গতিপথ সরল এবং সোজা নয়; বরং তা হলো দুর্গম, বন্ধুর এবং কন্টকাকীর্ণ।

তাই মুমিন ব্যক্তি মাত্রই বিশ্বাস করে যে, যত সংকটই আসুক না কেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। ফলে সে বিপদ-মুসিবতে পড়েও ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করে না। বরং নিজের ভাষা ও আচরণ সংযত রাখে। কারণ, সে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী । সে বিশ্বাস করে যে, মুমিনের জন্য বিপদ-মুসিবত নিয়ামতস্বরূপ। কারণ, এর দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট থেকে নি:সন্দেহে যথাযথ ও উপযুক্ত প্রতিদান পাওয়া যায়।

তাই মুমিন বিপদ-মুসিবতে পড়লে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি কান্নাকাটি করে। আল্লাহর কাছে নিজের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে। সৃষ্ট জীব থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে। আর এটাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিনের যথাযথ পরিচয়।

২. বিপদ-মসিবতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

বিপদ মসিবত শব্দের আভিধানিক অর্থের ব্যাপারে আরবি অভিধান বেত্তাগণ একবচনে বহুবিদ শব্দের ব্যবহার করেছেন। তন্মধ্যে- خطر - مصيبة - افة - مشكلة - نازلة - محنة - عاهة - شديد ইত্যাদি।[1] যাদের বহুবচন হচ্ছে যথাক্রমে- اخطر - مصائب - افات - مشاكل - محن - عاهات - شدائد।[2]

বিপদ বা মসিবত শব্দের অর্থ সম্পর্কে আরবি অভিধানে বলা হয়েছে :

البلاء معناه فى اللغة والمحنة وفى الاصطلاح التى تنزل بالمرء ليختبر بها

অর্থাৎ- "বান্দার উপর আপতিত বিবিধ বিপদ-আপদ, দুঃখ কষ্ট যদ্বারা বান্দাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।[3]

মূলত বান্দার ঈমানের দৃঢ়তা, আল্লাহ রাব্দুল 'আলামীনের উপর অটুট ও অবিচল তাওয়াক্কুল পরীক্ষা- নীরিক্ষার জন্যই এসব বিপদ-আপদ-বালা-মুসিবতের আবর্তন ঘটে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক সৃষ্ট এ মানব জাতি "আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি অভিধায় ভূষিত। এ মানব জীবনের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যু অবধি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আল্লাহর প্রিয় ভাজন তথা নবী-রাসূল, আওলিয়ে কামিলিন, মুসলিম-মু'মিনের জীবনে, যুগ-যুগান্তরে, কাল-কালান্তরে, দেশ-দেশান্তরে অসংখ্য বিপদ-মসিবতের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছে। দৃঢ়তার সাথে এবং মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করে এসব বিপদ-

মসিবত থেকে উত্তরণে অত্যন্ত ও সহজ বোধ্য ভাষায় বিধৃত হওয়া কুর'আন-সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ও আদেশ-উপদেশাবলী, নীতিমালা অনুসরণ করাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ও আদর্শ হিসেবে তাঁদের কাছে বিবেচিত হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহয় বালা-মুসিবতের বেশ কিছু পরিভাষা আমরা দেখতে পাই। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিভাষাগুলো হলো;

١. مصيبة - ٢. بلاء ٣. سر ৪. ضر ٥. بأس - ٦. شدة

যেমন কুর'আন বর্ণিত আছে-

وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ(١٥٥) الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ-

---

[1]. সম্পাদনা পরিষদ, বাংলা-আরবি অভিযান, (ঢাকা: ইফাবা, জুন:২০১৫খ্রি.) পৃ. ৭৪১।

[2]. প্রাগুক্ত।

[3]. ইব্রাহিম মাদকুর, আল মু'জামুল ওয়াসীত, (দেওবন্দ: জাকারিয়া বুক ডিপো, সাহরানপুর, প্রথম সংস্করণ, ২০ আগস্ট, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ৭১।

قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ□ (١٥٦)

অর্থাৎ- “আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন; যাদেরকে কোনো বিপদ আক্রান্ত করলে তারা বলে, ‘আমরা তো আল্লাহর জন্যই, তাঁর কাছেই তো আমরা ফিরে যাব ।[৪]

আল কুরআনের অন্যত্র আছে-

وَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ
الْبَاْسِ□-اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا□-وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُوْنَ(١٧٧)

‘যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট, দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী ।[৫]

৩. বিপদ-মুসিবত উত্তরণে কুর'আন সুন্নাহর আলোকে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত নীতি ও আদর্শ

এটা সর্বজন স্বীকৃত ও বিধিত যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (Complete Code of Life) এর প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানব জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অগণিত অজস্র সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও অনুকরণ ।

প্রকৃতপক্ষে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত্র শোভাই সকল সমস্যার সমাধানের অন্যতম নিয়ামক। উম্মাহাতুল মু'মিনিন হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.)কে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত্র শোভা সম্পর্কে জনৈক সাহাবা (রা.) কর্তৃক জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাৎক্ষণিক জাওয়াব প্রদান করলেন : خلقه القران অর্থাৎ মহাগ্রন্থ আলকুর'আনই হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত্র শোভা (Unique Character)। উপরোক্ত হাদিসে মুবারাকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আলকুর'আন (وحى متلوا) ও আল-হাদিস (وحى غير متلوا) এ দ্বিবিধ অনুষঙ্গই আমাদের জীবনের সকল সমস্যা তথা বিপদ- আপদ, বালা-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনা ইত্যাদি থেকে উত্তরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ও আদর্শ যা প্রতিটি মুসলিম-মুমিনের একনিষ্ঠ অনুসরণ-অনুকরণ করা অতীব বাঞ্চনীয়। আম্বিয়া কিরামগণের মাঝে হযরত আইয়ুব আলায়হিস্ সালাম পবিত্র জীবন থেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পবিত্র কুর'আন কারীমে এসেছে-

وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ□ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ
اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۚ (٨٣)

অর্থাৎ স্মরণ করো আইয়ুব আলায়হিস্ সালামের কথা, ঘখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে ডেকেছিল : (এই বলে যে) আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েছি, আপনি তো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ।[৬]

হযরত আইয়ুব আলায়হিস্সালামের উপর্যুক্ত প্রার্থনা থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে. অর্থাৎ- আমার এ দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত ইত্যাদি উত্তরণে খালিক-মালিকই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল। আমি এ ব্যাপারে আর কারো কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়ার প্রত্যাশী নই ।

বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ও আদর্শ। আর রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন- خلقه القران বা মহাগ্রন্থ আল কুর'আনই হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত্র শোভা (Unique Character)র প্রতিচ্ছবি। তাই মুসলিম-মুমিনের আদর্শ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত আদর্শই একনিষ্ঠ আদর্শ হওয়া বাঞ্চনীয় ।

কুর'আনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ□-
اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ(١٥٣)

অর্থাৎ “হে মুমিনগণ, ধের্য ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহর বারেগাহে) সাহায্য চাও। নিশ্চয়; আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন ।[৭]

আর বিপদগ্রস্থ হয়ে যারাই ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশা করেছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকেই কালক্রমে সমূহ বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত থেকে তাঁর অপার করুণায় মুক্তি দিয়েছেন।

কুরআনে কারীমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ
رَابِطُوْا-

---

[৪] আলকুর'আন, সুরা : ২ (বাকারা) : ১৫৫-১৫৬ ।

[৫] আলকুর'আন, সুরা : ২ (বাকারা) : ১৭৭ ।

[৬] আলকুরআন, সুরা : ২১ (আম্বিয়া) : ৮৩

[৭] আলকুর'আন, সুরা : ২ (বাকারা) : ১৫৩

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ(٢٠)

অর্থাৎ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্য্যে অটল থাক এবং (তোমাদের কুপ্রবৃত্তির) পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও ।[৮]

আর আল্লাহকে ভয় করলে সফলতা সুনিশ্চিৎ। এর কোন ব্যত্যয় ঘটবেনা । ইনশাআল্লাহ ।

হাদীস শরীফে এসেছে সালাতে দুই সাজদার মাঝখানে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদ-আপদ-বালা-মুসিবত সহ সর্বপ্রকার কাঠিন্যতা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দু‘আটি পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَارْفَعْنِىْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে দিন, আপনি আমার ওপর রহম করুন, আপনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আপনি আমার জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পুরণ করে দিন, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আপনি আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন ।[৯]

উপর্যুক্ত দোয়া দ্বারা আমরা প্রতি ওয়াক্ত নামাযের প্রতি রাকাতে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি-আদর্শের অনুসরণ-অনুকরণে আল্লাহর অপার করুণায় তাঁর রাহমাত-মাগফিরাত-দয়াসহ বিপদ-আপদ-বালা-মুসিবত-রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির প্রত্যাশা করতে পারি ।

> *বস্তুত মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে সকল গুনাহ্ বা অপরাধ করে সেগুলোই মূলত তার জন্য বিপদ-মুসিবত ও রোগশোক বয়ে আনে অথবা মু’মিন জীবনের পাপমুক্তির কারণ হিসেবেও রোগ শোক হয়ে থাকে। সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্য মানুষের জীবনে প্রকৃত মুক্তি, আরোগ্য ও আনন্দ বয়ে আনে। পাপীরা সুস্থ ও সম্পদশালী হলেও তারাই মূলত বিপদগ্রস্থ। পক্ষান্তরে সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হলেও তারাই মূলত বিপদমুক্ত ।*

বিপদ-মুসিবতে পতিত কোনো ব্যক্তিকে দেখলে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দু‘আটি পাঠ করতে নসিহত করতেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِه
وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

অর্থাৎ ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে ওই মসীবত থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যার মধ্যে তিনি তোমাকে পতিত করেছেন এবং আমাকে মর্যাদা দান করেছেন অনেক সৃষ্টি জগত থেকে ।[১০]

অনুরূপভাবে খারাপ দিন-রাত, মন্দ-সময়, খারাপ সঙ্গী ও প্রতিবেশি থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দু‘আটি পাঠ করতে নসিহত করেছেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِىْ دَارِ الْمَقَامَةُ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দিন-রাত, মন্দ সময়, মন্দ সঙ্গী ও খারাপ প্রতিবেশি থেকে পানা চাচ্ছি ।[১১]

হৃদয়ের গভীরে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, ভালোমন্দ সবকিছুই আল্লাহর হাতে। মানুষের হৃদয় তারই একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে। তিনি চাইলে এ হৃদয়কে ঈমানের আলোয় আলোকিত করতে পারেন, আবার কুফরের অন্ধকারেও নিমজ্জিত করতে পারেন। কাজেই আলোর জন্য প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়াই সচেতন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার দেখানো এবং শিখানো রীতি-আদর্শ অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনকে আল্লাহর অশেষ অনুকম্পায় পরিপূর্ণ করে নিতে পারি ।

পবিত্র কালামুল্লাহ্ শরীফে এরশাদ হয়েছে-

اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল ।’

[আল-কুরআন, সূরা (নাহল): ১২৮]

---

[৮]. আলকুর'আন, সুরা : ৩ (আল-ইমরান) : ২০০

[৯]. আবূ দাউদ, ১ম খন্ড, পৃ. ১২১, হাদীস নং-৮৫০, তিরমিযী, হাদীস নং-২৮৪, ২৮৫, ইবনে মাযাহ্, হাদীস নং-৮৯৮ ।

[১০]. হিসনে হাসীন, পৃ. ৩০৭ ।

[১১]. হিসনে হাসীন, পৃ. ৩০৭ ।

পবিত্র কালামুল্লাহ্ শরীফের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।

[আল-কুরআন, সূরা: (আনকাবুত): ৬৯]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তাকওয়া, সৎকর্ম, দোয়া, সালাত ও ধৈর্যই হচ্ছে বিপদ উত্তরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ও আদর্শ। আর ধৈর্য্যশীলদের পুরস্কার তিনগুণ (নি'আমত, রহমত ও হিদায়ত) পবিত্র কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ(١٥٥) الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ- قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ□ (١٥٦) اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ- وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ(١٥٧)

অর্থাৎ আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন, যাদেরকে কোনো বিপদ আক্রান্ত করলে তারা বলে, 'আমরা তো আল্লাহর জন্যই, তার কাছেই তো আমরা ফিরে যাব। এদের প্রতি রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও করুণা আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।

[আল কুরআন, সূরা ২ (বাক্বারা): ১৫৫-১৫৭]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন 'জেনে রাখো, সবরের সাথেই সাহায্য রয়েছে।

[আস-সুন্নাহ্, ইবনে আবী আসিম: ৩১৫: আল মু'জামুল কবীর, তাবরানি: ১১২৪৩]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের সমুদয় ভালো কাজ আল্লাহর একটি মাত্র অনুগ্রহেরই মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নি'মাত ও অনুগ্রহ ও মানুষের সমুদয় সৎকাজের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। সুতরাং আমাদের প্রতি আল্লাহর যে অধিকার রয়েছে, তার প্রতি সব সময় সজাগ ও যত্নশীল থাকা উচিত। হযরত শাকীক বলখি (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট বিপদাপদের অভিযোগ করবে, সে কখনো তার অন্তরে আল্লাহর আনুগত্যের স্বাদ পাবেন না। বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশা, বালা-মুসিবতে কাপড় ছেঁড়া, বুক ও কপাল চাপড়ানো, হাত থাপড়ানো, চুল কামানো, এমনকি ধ্বংসের জন্য দু'আ করা ইত্যাদি মূলতঃ অধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ বিধায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন। তাই আমাদেরকে সর্বদা-সর্বাবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত রীতি-আদর্শ অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যধে বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, দুঃখ-দুর্দশা উত্তরণের শিক্ষা নিতে হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা আমল করার তাওফিক দিন। আমিন।

লেখক, উপাধ্যক্ষ-ফয়জুলবারী ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা, কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম।

কষ্ট মুমিন জীবনের একটি অধ্যায়!

মুহাম্মদ ওসমান গণি

পৃথিবীতে বাস্তব জীবন পরিচালনায় কিছু কিছু সময় কষ্টে পড়তে হয় । এটা জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া । এ কষ্টের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অনেকটা সুদৃঢ় । যেসব বান্দা আল্লাহর প্রিয়ভাজন হয়েছেন, যাদের নাম ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁদের জীবন পর্যালোচনা করলে এ কষ্ট নামক অধ্যায়টি অতি সহসা বেরিয়ে আসে । এযাবৎকালে অবশ্য কারো কারো জীবনে এ কষ্টটা বিলাসিতার মতো । আবার কারো ক্ষেত্রে অত্যন্ত অসহনীয় । বর্তমান সময়ে করোনা মহামারীর ক্রান্তিলগ্নে কষ্টের বেড়াজালে আক্রান্ত হয়ে কিছু মানুষ প্রায় দিশে হারার মতো । আর এ মহামারী মানুষের উপার্জিত মন্দ আমলের ফসলও হতে পারে তার কারণ । অথবা এগুলো হলো মুমীনের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ । তবে এটা চিরন্তন সত্য যে, মহান আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কষ্ট বা বোঝা চাপিয়ে দেন না ।

পবিত্র কোরআনে কতইনা সুন্দরভাবে এসেছে, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা অর্পণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ । তার জন্য কল্যাণ, যে ভালো সে উপার্জন করেছে । আর তার জন্য ক্ষতি, যে মন্দ সে উপার্জন করেছে ।[১২]

মানব জীবনে এই কষ্ট নানান দিক থেকে আসে । প্রতিটা কষ্টে মানুষ কিছু না কিছু হারায় । কেউ কেউ হয়তো ভাবেন, মহান আল্লাহ তাআলাকে এতো করে মেনে চললাম, এবাদত বন্দেগীও করলাম তাও কষ্ট দিলেন, চাকরিটা কেড়ে নিলেন, ফসল নষ্ট করে দিলেন কিংবা প্রিয়জন কেড়ে নিলেন!? আল্লাহর প্রতি হয়তো বান্দার বিশাল অভিমান, কী অপরাধে আল্লাহ এত কষ্ট দিচ্ছেন? অথচ একবারের জন্য হলেও মানুষের ভাবা উচিত । মহান প্রভুর অমীয় বাণী- 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি মানুষকে হাসান এবং কাঁদান (অর্থাৎ হাসি-কান্নার মূল ও কারণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে পৃথক পৃথক) । তিনিই তো মৃত্যু দেন, জীবন দেন ।[১৩]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন ।[১৪] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু সালেহ ও ইবনে জারীর রহ. প্রমুখ তাফসীরকারক এরূপ উক্তি করেছেন , ধন-সম্পদ তাঁরই অধিকারে রয়েছে যা তাঁর কাছে পুঁজি হিসাবে থাকে । তিনি তা থেকে যাকে যতটুকু দান করেন সে তা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারে ।[১৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, ' নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পত্তি, জীবন এবং ফল-ফসল হারানো দিয়ে পরীক্ষা করব । এবং ওইসব ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান কর!, যাদের উপর জীবনে কোনো বিপদ আসলে তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে, " নিশ্চয়ই আমরা তো আল্লাহরই জন্য । নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তণকারী" তাঁদের উপর তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে আছে বিশেষ অনুগ্রহ এবং শান্তি । এধরনের মানুষরাই সুপথগামী (সঠিক পথে রয়েছে) । [১৬]

আল্লাহ বলেন, "ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির ।[১৭]

এসব কিছুর ভাবার্থ এই যে, সামান্য ভয়-ভীতি, কিছু ক্ষুধা, কিছু ধন-সম্পদের ঘাটতি, কিছু প্রাণের হ্রাস অর্থাৎ নিজের ও অপরের, আত্মীয়-স্বজনের এবং বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু, কখনো ফল-ফলাদি এবং উৎপাদিত শস্যের ক্ষতি ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন । এতে ধৈর্যধারণকারীদের তিনি উত্তম প্রতিদান দেন এবং অসহিষ্ণু, তাড়াহুড়াকারী এবং নৈরাশ্যবাদীদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন । এ জন্যই তিনি বলেন, ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ ।[১৮]

---

[১২] সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬ ।

[১৩] সুরা নাজম, আয়াত: ৪৩-৪৪ ।

[১৪] . সুরা নাজম, আয়াত: ৪৮ ।

[১৫] . তাফসীরে ইবনে কাসীর- ২৭/ ১৬৬ ও তাবারী ২২/৫৪৮,৫৪৯ ।

[১৬]. সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭ ।

[১৭] . সূরা নাহল, আয়াত ১১৬

[১৮] . তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৪২৬,৪২৭ ।

আল্লাহ বলেন, "অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং পরহেজগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।'[১৯]

অন্য দিকে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না যে, তারা প্রতিবছর একবার অথবা দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়? এরপরও তারা তাওবা করে না, আর না তারা উপদেশ গ্রহণ করে (অর্থাৎ উপলব্ধি করার চেষ্টাও করে না)।'[২০]

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দুঃখ-কষ্টে পতিত করেন।'[২১]

> *মানুষের প্রতিটা কষ্টের সঙ্গে সুখ মিশে আছে। ধৈর্যশীল মানুষ সেই সুখের অপেক্ষা করেন। তারা জানেন, জীবনে যত ঘোর-অন্ধকার আসুক না কেন, এক সময় আল্লাহ চাহে তো তা কেটে যাবে। কষ্টের এ সময়গুলোতে ধৈর্য্যের সঙ্গে অবিচল থাকাই মুমিনের গুণ।*

উম্মুল মু'মীনীন আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের চাইতে বেশী রোগ যন্ত্রণা ভোগকারী কাউকে দেখিনি।[২২]

আলোচ্য হাদিসে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে-মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তেন, এবং কুরআন মাজীদে সুরা আম্বিয়াতে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে উক্ত রোগ যন্ত্রণা হতে নিস্কৃতি চেয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করেছেন। উক্তাবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করেছেন, আর এটাই হলো উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আসল শিক্ষা।

রাসুলে পাক দ. আরো বলেন, 'যদি কারো উপর কোনো কষ্ট আসে, আল্লাহ তায়ালা এর কারণে তার গুনাহসমূহ ঝরিয়ে দেন, যেমনভাবে গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে।'[২৩] সুখ-সচ্ছলতায় মুমিন শোকর আদায় করে ফলে তার কল্যাণ সাধিত হয়। আবার দুঃখ-কষ্ট-বিপদের মুখোমুখি হলে ধৈর্য্য ধারণ করে। ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।'[২৪]

সুতরাং ঈমানদারের জন্য যে কোনো সময় দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ এমনকি মৃত্যুও আসতে পারে। মুমিন বান্দা সব ক্ষেত্রেই দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে এবং ঈমানের ওপর দৃঢ় থাকতে প্রস্তুত থাকবে। আর তাতেই থাকবে ঈমানদারের জন্য কল্যাণ। মুমিন বান্দা সুখের সময় যেমন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে তেমনি কোনো বিপদের কারণে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া মুমিনের শান নয়। কারণ যে কোনো সময় মুমিনের অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। মনে রাখতে হবে!

মুমিন কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। আল্লাহর ঘোষণাও এমন- ' তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।'[২৫] যারা আল্লাহর রহমতের ওপর অবিচল থাকে তারাই প্রকৃত ঈমানদার ও তাকওয়ার অধিকারী। আর সফলতা তাদের জন্যই সুনির্ধারিত।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, সুখের সময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আর বিপদে পরিস্থিতির মোকাবেলা করার সক্ষমতা না থাকলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে ধৈর্য ধারণ করা। পবিত্র হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী তাতেই রয়েছে দুনিয়া ও পরকালের শান্তি এবং নিরাপত্তা।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ কিংবা দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি হতে উত্তীর্ণ হতে তাঁর উম্মতকে এ দোয়া পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন-

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ

অর্থাৎ : আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই হলেন উত্তম কাজ সম্পাদনকারী। আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী।'

---

[১৯] . সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮৬
[২০] . সুরা আত-তাওবা, আয়াত:১২৬
[২১] . বুখারি শরীফ, হাদিস নং: ৫৬৪৫
[২২] . মুসলিম শরীফ, হাদিস নং: ২৫৭০ ও মুসনাদে আহমদ, (ই.ফা. ৫১৩০)
[২৩] . বুখারি শরীফ, হাদিস নং: ৫৬৪৮ , মুসলিম শরীফ, হাদিস নং: ২৫৭১ (ই.ফা. ৫১৩১)
[২৪] . মুসলিম, ইবনে হিব্বান
[২৫] . সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন একদা আমার স্বামী আবু সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে আমার কাছে আসেন এবং অত্যন্ত খুশি মনে বলেন, আজ আমি এমন একটি হাদিস শুনেছি, যা শুনে আমি খুবই খুশি হয়েছি। হাদিসটি হলো- যখন কোন মুমীনের উপর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ আসে এবং সে নিম্নের দোআটি পাঠ করে তখন আল্লাহ তাকে অবশ্যই বিনিময় ও প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

اللّهمّ أجِرْنِى فِي مُصِيْبَتِي وَأَخْلِفْ لِى خَيْرًا مِنْها

হে আল্লাহ! আমাকে মুসিবতের (বিপদে) সময় ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি দাও এবং উহার পরিবর্তে উত্তম কিছু দান কর। [তাফসীরে ইবনে কাসীর- ২/৪২৮।]

বিশ্বব্যাপী মুসলমানের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ ঈমানদারদের হারানোর কিছু নেই। তাদের বিপদ-আপদে, দুঃখ-কষ্টেও রয়েছে কল্যাণ, মর্যাদা ও সম্মান। বরং পরাজয় কিংবা ধ্বংস সেসব ব্যক্তি গোষ্ঠীর জন্য যারা মুসলমানদের ওপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করে।

মুমিন বান্দাকে বিপদে ভয় পেলে চলবে না, মুমিনের কষ্টও সম্মান এবং মর্যাদার কারণ। তাই মুমিন বান্দা নিজেকে ঈমানি তেজে শক্তিশালী করবে। আল্লাহর কাছে হিম্মত ও সাহায্য প্রার্থনা করবে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন, ‘প্রতিটি কষ্টের সঙ্গে অবশ্যই কোনো না কোনো দিক থেকে স্বস্তি রয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, অবশ্যই প্রতিটি কষ্টের সঙ্গে অন্য দিকে স্বস্তি আছেই।’ [সুরা আল-ইনশিরাহ, আয়াত: ৫-৬]

পরিশেষে বলা যায় দুঃখ-কষ্ট মুমিন জীবনের একটি অন্যতম অধ্যায়। আর মুমিনের প্রতিটি কষ্টই ক্ষণস্থায়ী। এ কষ্টের বিনিময়ে মুমীন বান্দাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে সুখের সময় কৃতজ্ঞতা ও দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর একান্ত রহমত লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন।

লেখক: সহকারী মৌলভী, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদরাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রবন্ধ

মুমিনের ঘর-বাড়ি ঃ আলোকিত ঠিকানায় সমৃদ্ধ জীবন-যাপন

মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

মানুষ সামাজিক জীব। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনে অভ্যস্থ। সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনের প্রথম ভিত্তি হলো পরিবার। একজন মানুষের যে সমস্ত মৌলিক অধিকারগুলো রয়েছে তম্মধ্যে অন্যতম হলো বাসস্থান। প্রত্যেক মানুষই চাই নিজের মাথা গুজাবার একটি ঠিকানা। সেটি কারো জন্য হতে পারে ছনের ছাউনিতে তৈরি, কারো জন্য টিনের ছাউনি কিংবা কারো জন্য সুরম্য দালান-কোঠা। বাসস্থান শুধু বসবাসের জায়গা নয় বরং সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে সুখ-শান্তি অর্জনের অপূর্ব মিলন কেন্দ্র। কর্মজীবনের সারাদিনের ক্লান্তি, অবসাদ যাই হোক বেলা শেষে ঘরে ফিরে গেলে প্রশান্তিতে ভরে যায় মানুষের মন। মুমিনের ঘর-বাড়ি ঈমানের ছায়ায় শীতল, কুরআন-সুন্নাহর আলোতে আলোকিত। জাগতিক সুখ, অর্থের প্রাচুর্যতা না থাকলেও ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে সুখের পরশ সর্বদা বিরাজমান। কোনো মুমিন বান্দা যদি তার পরিবারকে ইসলামী নিয়ম নীতির আলোকে ঈমানী চেতনায় সাজাতে পারে তাহলে সেই পরিবারই হবে প্রকৃত সুখ–শান্তিতে পরিপূর্ণ ও পরকালে মুক্তির অন্যতম অবলম্বন।

১. পৃথিবীতে মানব জাতির প্রথম ঘর-বাড়ি নির্মাণ

মানব ইতিহাসে প্রথম পরিবার গঠিত হয়েছিল প্রথম মানব ও প্রথম নবি হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত হাওয়া আলায়হাস্ সালামকে কেন্দ্র করে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বলেন, হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে ঐ বৃক্ষের কাছে যেওনা। [সূরা আরাফ-১৯]

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম যখন পৃথিবীতে আগমন করেন তখন পৃথিবীতে সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের উপযুক্ত পরিবেশ ছিলনা। পাহাড়-পর্বত ও বন-জঙ্গলে ভরপুর ছিল পৃথিবী। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এর নাতি মাহলাইল ইবনে কায়নান পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম মানুষের বাসযোগ্য ঘর-বাড়ি ও শহর স্থাপন করেন। তিনি দুটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। একটি হলো বাবিল বর্তমান ইরাক এবং সোস যা বর্তমান ইরানের খুজাস্তান নগরী। তার প্রতিষ্ঠিত শহরে তিনি বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, কৃষি কাজের উৎসাহ, জীব জন্তুর পশম দিয়ে কাপড় তৈরির পদ্ধতি অবিষ্কার করেন। [আল কামিল, ইবনুল আসির ঃ ৫৩-৫৪]

২. মানুষের ঘর আল্লাহরই একটি অনুগ্রহ

বিশ্বে এখন প্রায় ৭৭৭ কোটি মানুষের বসবাস এদের মধ্যে অর্ধেক লোক নগরে বসবাস করে। শহরে বাসস্থান ও গ্রামে বাসস্থানের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে আদ জাতির পরে সর্দার করেছেন, তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ কর সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা। [সূরা আরাফ-৭৪]

অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন- আল্লাহ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এবং চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমাদের জন্য তাবুর ব্যবস্থা। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থানকালে পাও। [সূরা আন নাহল-৮০]

ইমাম কুরতুবি রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যে বস্তু তোমাদের মাথার উপর রয়েছে এবং তোমাদেরকে ছায়া দান করে তাকে ছাদ ও আকাশ বলা হয়। যে বস্তু তোমাদের অস্তিত্বকে বহন করে তা হলো জমিন এবং যে বস্তু চারদিক থেকে তোমাকে আবৃত করে রাখে তা প্রাচীর। এসব গুলো কাছাকাছি একত্রিত হয়ে গেলে তাকে বলা হয় ঘর বা বাসস্থান। [তাফসীরে কুরতুবী]

৩. মুমিনের ঘর বাড়ির বৈশিষ্ট্য

মুমিনের ঘর কেমন হবে তার উত্তর খুঁজতে হবে প্রিয় নবি রাহমাতুল্লিল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঘর বাড়ির অবস্থা থেকে। তিনি কীভাবে বসবাস করতেন কীভাবে রাত্রি যাপন করতেন, কীভাবে ঘরে প্রবেশ করতেন, কীভাবে বের হতেন তার সকল কিছুই উম্মতের জন্য পরিপূর্ণ অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। জাগতিক দিক

থেকে সেখানে ছিলনা দামী বিছানা, মূল্যবান খাবার, এবং ছিলনা আরাম আয়েশের ও ভোগ বিলাসের কোনো উপকরণ। কিন্তু সেখানে ছিল আল্লাহর স্মরণে বা যিকিরের রুটিন, আনুগত্য ও ভালোবাসার পূর্ণাঙ্গ রূপ। প্রার্থী যেই আসুক খালি হাতে ফিরত না কেউ। আল্লাহর রহমতের অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রসারিত হতো সরাক্ষণ। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোজাহানের বাদশাহ হয়েও অত্যন্ত সাদামাটা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। ঘরের কাজে আপন স্ত্রীদের সাহায্য করতেন। নিজের কাজ নিজেই করতে পছন্দ করতেন। হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কীভাবে তার গৃহে সময় কাটাতেন? তিনি বললেন, তিনিও তোমাদের মতো গৃহস্থলীর কাজে মশগুল থাকতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, নিজের জুতা নিজেই মেরামত করতেন।

একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন এতে তার শরীরে চাটাইয়ের দাগ বসে গেল। তখন আমরা (সাহাবারা) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি আপনার জন্য নরম বিছানার ব্যবস্থা করে দেই? তখন তিনি বললেন দুনিয়ার সাথে আমার কী সর্ম্পক? আমিতো কেবলমাত্র একজন আরোহী যে একটা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিল আবার কিছুক্ষণ পর তার গন্তব্যে চলে গেল। [তিরমিজী-২২৯৯]

৪. মুমিনের ঘর আল্লাহর যিকিরে সরব

মুমিনের বাড়ি একটি ঈমানি প্রতিষ্ঠান। এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়ে ব্যস্ততা অনুভব হয়। যেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহার পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ যে সব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তার নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। [সূরা আন-নূর : ৩৬]

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় আর যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়না এরূপ দু'টি ঘরের তুলনা হচ্ছে জীবিত ও মৃতের সাথে। [সহীহ মুসলিম-৭৭৯]

ঘরের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তায়ালা অপরিসীম বরকত দান করেন, শয়তান প্রবেশেও বাধা প্রাপ্ত হয়। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, তোমরা ঘরকে কবর বানাবেনা, যে ঘরে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করা হয় সেই ঘর হতে শয়তান পলায়ন করে। [সহীহ মুসলিম-৭৮০]

৫. সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করা

সালাম ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন, সালামের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, অতঃপর গৃহে প্রবেশ করার সময় তোমরা নিজেদের লোকদের সালাম করো, অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের সামনে বিশ্বদ ভাবে বর্ণনা করেন আয়াত সমূহ যাতে তোমরা বুঝতে পার। [সূরা আন-নূর:৬১]

একদা একব্যক্তি প্রিয় নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে আসে এবং দরজা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে "আ-আলুজ?" আমি কী ভেতরে প্রবেশ করবো? নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় বাঁদী রওজাকে বলেন, এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানেনা। তাকে বলে এসো সে যেন 'আস্‌সালামু আলাইকুম আ- আদখুলু' অর্থ, সালাম দিয়ে আমি কি ভিতরে আসতে পারি? বলে অনুমতি চায়। (আবু দাউদ)

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর যিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহলে রিজিকে প্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয় এবং যদি তারা মৃত্যু বরণ করে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করে।

১. যে ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশ করে সালাম দেয় সে আল্লাহর যিম্মায় থাকে।
২. যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহর যিম্মায় থাকে।
৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয় সে আল্লাহর যিম্মায় থাকে। [আবু দাউদ-২৪৯৪]

৬. অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা

কারো ঘরে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুমিনরা! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে প্রবেশ করোনা যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না করো এবং গৃহবাসীকে সালাম না করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করোনা। যদি

তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। [সূরা আন-নুর ঃ ২৭-২৮]

নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অভ্যাস ছিলো যখন কারো বাড়িতে যেতেন দরজার ঠিক সামনে কখনো দাড়াঁতেন না। কারণ সে যুগে দরজায় পর্দা লাগানো থাকতো না। তিনি দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেন। [আবু দাউদ]

৭. ইসলামের বাসস্থান সম্পর্কিত নীতিমালা

আল্লাহ তায়ালাই পৃথিবীতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। নিরাপদ জীবন যাপনের জন্য ইসলামের বিধানমতো ও নির্দেশিত নিয়ম মেনে ঘর বাড়ি নির্মাণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে গৃহ নির্মাণ ও অপচয় না করে সাজসজ্জা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, মুসলিম ব্যক্তিকে তার ব্যয় করা প্রতিটি বস্তুর জন্য সাওয়াব দান করা হয়ে থাকে, তবে যা সে মাটিতে মিশিয়ে দেয় তার জন্য নয়। [সহীহ বুখারী-৫৬৭২]

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে এমনভাবে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে হবে যাতে পরিবারের সদস্যরা আপন আপন মর্যাদায় স্বাচ্ছন্দে আশ্রয় পায় এবং নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। এজন্য রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, চারটি জিনিস সৌভাগ্যের প্রতীক। সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোক, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং ধৈর্যশীল (আরাম দায়ক) বাহন। [আল আদাবুল মুফরাদ-৪৫৯]

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার জিহ্বাকে সংযত রাখতে পেরেছে, বাড়িকে প্রশস্ত করেছে এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করেছে। [আত-তারগীব-২৮৫৫]

৮. ঘরকে প্রাণীর ছবি ও কুকুরমুক্ত রাখা

ঘরে কোনো প্রাণীর ছবি টাঙানো জায়েজ নেই। কারণ যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। হযরত আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে।

[সহীহ বুখারী - ৩২২৫, মুসলিম - ২১০৬]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা একটি বালিশ ক্রয় করেছিলেন তাতে ছবি আঁকা ছিল। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে প্রবেশের সময় তা দেখতে পেলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাড়িঁয়ে গেলেন। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নবিজীর চেহারা মোবারক দেখে বুঝতে পেরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি আল্লাহ ও তার রাসূলে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট তাওবা করছি। আমি কী পাপ করেছি? নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই ছোট বালিশটি কোথায় পেলে! তিনি বললেন, এটি আপনার জন্য ক্রয় করেছি যাতে আপনি হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, নিশ্চয় যারা ছবি তোলে বা অংকন করে কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং বলা হবে তোমরা যাদের তৈরি করেছ তাদেরকে জীবিত কর। তিনি বললেন, যে ঘরে ছবি থাকে রহমতের ফেরেশতা সেখানে প্রবেশ করেনা। [সহীহ বুখারী-৫৯৬১]

ঘরের মধ্যে কুকুর পালন করলে নেকী হ্রাস পায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি শস্য ক্ষেতের পাহারা বা পশুর হিফাজতের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করে, প্রতিদিন তার আমল হতে এক কীরাত কমতে থাকবে।

[সহীহ বুখারী-৩৩২৪, সহীহ মুসলিম-১৫৭৫]

৯. ঘর বাড়ির পরিবেশকে দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর রাখা

আদর্শ ঘার বাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দূষণমুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘর বাড়ির আঙ্গিনা ও এর আশেপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি নির্মল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি সুমহান, মহত্ত্বকে ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, বদান্যতাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের আঙ্গিনাসমূহ। তোমরা ইয়াহুদীদের মত হয়োনা। [তিরমিজী, আবওয়াবুল আদব-২৭৯৯]

সুন্দর পরিবেশের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ মলমূত্রের মাধ্যমেই সমাজে অধিকাংশ রোগজীবাণূ ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ

পরিহার করো। তা হলো মানুষের ছায়া গ্রহণের স্থানে, যাতায়াতের স্থানে এবং পানির ঘাটে মলমূত্র ত্যাগ করা ।

[আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত-২৬]

সুন্দর পরিবেশের জন্য যা যা প্রয়োজন পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা তার সবকিছুই দান করেছেন। যেমন: মাটি, পানি, বায়ু, গাছপালা, ইত্যাদি মানব জাতির নিজেদের প্রয়োজনে আল্লাহর নিয়ামতের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং এর বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। কেননা বায়ু যদি দূষিত হয়, জলাশয়গুলি যদি দূষিত হয়, পয়ঃপ্রণালী গুলি দুর্গন্ধযুক্ত ও স্যাঁতসেঁতে স্থানে হয় তাহলে ঐ বায়ু ও পরিবেশ দূষিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জীবকূলকে রোগাক্রান্ত করে তোলো ।[ইবনে খালদুন, আল মুকাদ্দিমা, ১ম খন্ড পৃ: ৫৮১]

১০. পানি ও খাবারের অপচয় রোধ করা

ঘর বাড়ি নির্মাণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে যাতায়াতের পথ সুগম ও নিরাপদ হয়, অত্যাবশ্যকীয় নাগরিক সেবা প্রাপ্তি যাতে সহজ হয়। সু-শৃঙ্খল ও আরামদায়ক জীবন যাপনের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি বিদ্যুতের ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা জরুরী। আল্লাহ তায়ালাই পৃথিবীর সকল সেবাকে মানুষের জন্য সহজ প্রাপ্যতার উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হলো তিনি ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে এর দ্বারা তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে।

[সূরা বাকারা-২২]

জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ হলো পানি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, এবং প্রাণবন্ত সবকিছুই আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম, এরপরও কী তারা ঈমান আনবেনা।

[সূরা আম্বিয়া-৩০]

পানির অপচয় রোধ করতে ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, তোমরা খাও ও পান কর কিন্তু অপচয় করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেনা। [সূরা আরাফ-৩১]

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা পানাহার করো, দান-সাদকা করো এবং পরিধান করো যতক্ষণ না তার সাথে অপচয় বা অহংকার যুক্ত হয়।

[ইবনে মাজাহ-৩৬০৫]

১১. নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমার সন্তানদের ঘরে প্রবেশ করাও। কেননা এসময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করলে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর ঘরের দরজা বন্ধ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারেনা। আর তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাদের মশকের মুখ বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাদের পাত্রগুলোকে ঢেকে রাখবে। কমপক্ষে পাত্রগুলোর উপর কোন কিছুকে আড়াআড়ি করে রেখে দাও। আর শয্যা গ্রহণের সময় তোমরা তোমাদের প্রদীপগুলো নিভিয়ে দিবে। [সহীহ বুখারী-৫৬২৩, সহীহ মুসলিম-২০১২]

সামর্থানুযায়ী আরামপ্রদ ও মনোরম বাসস্থান তৈরি করে বসবাস করা মানুষ হিসেবে দায়িত্ব আর আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মুমিনের কর্তব্য। কেননা নিজের ঘরে থাকলে মানুষ নানারকম ফেতনা থেকে বাঁচতে পারে। ঘর বাড়ি হওয়া উচিত ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে যাতে করে ঘরের বাসিন্দারা নিজেদেরকে সার্বক্ষণিক আল্লাহর পথে চালাতে পারে। বিশেষত, কোনো পরিবার যদি আল্লাহ ও তার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শে পরিচালিত হয় তাহলে ঐ পরিবারে বেড়ে উঠা শিশুরাও বেড়ে ওঠে নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে। তারা ভবিষ্যৎ জীবনের একটি সুন্দর ভিত্তি পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হয়ে উঠে আলোকিত ঠিকানা।

লেখক: সহকারি শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।

সফলতার দুটি পথ ঃ রাগ সংবরণ করা ও সঠিক পথে স্থিরতা

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

রাগ

ধৈর্য্য, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি, ক্ষমা-মার্জনা মানব চরিত্রের সৌন্দর্যকে সমুজ্জ্বল করে; আর রাগ, ক্রোধ, রোষ, গযব ও প্রতিশোধস্পৃহার বহিঃপ্রকাশ ব্যক্তি মর্যাদাকে ধ্বংস করে দেয়। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাকে উত্তম চরিত্র আর ক্রোধ ও রাগকে মন্দ চরিত্রের আলামত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ক্বোরআনুল কারীমে রাগ সংবরণ করে ক্ষমা-মার্জনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে-

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

তরজমা: ওই সব লোক, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে সুখে ও দুঃখে, ক্রোধ সংবরণকারীগণ এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শনকারীগণ। আর আল্লাহ তা'আলা সৎব্যক্তিবর্গকে ভালবাসেন।[৬৯]

পবিত্র আয়াতে وَالْكَاظِمِيْنَ ক্রোধ সংবরণকারীদের কথা বলা হয়েছে। মশকের মুখ বন্ধ করা হলে, সেটার জন্য আরবিতে كظم ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মশকের মুখ এ জন্য বন্ধ করা হয় যাতে ভেতর থেকে কোন বস্তু বাহিরে না আসে। রহমতের কিতাব বলছে, মুত্তাক্বীর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে তার ভেতরের উষ্ণ আবেগ, প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা, বদলা নেয়ার সংকল্প, শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রভাবাদি, উত্তেজনার চরম অবস্থা, স্বীয় আবেগ-অনুভূতিগুলোর উপর এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যেমনিভাবে মশকের মুখ বন্ধ করে ভেতরের বস্তুগুলোকে ভেতরেই রুদ্ধ করে রাখা হয়, বাহিরে আসতে দেয়া হয়না, তেমনি তাক্বওয়ার পথ অবলম্বনকারী চরম উত্তেজনার সময়ে সৃষ্ট ক্রোধ, রাগ, গযবকে বাহিরে আসতে দেয়না, যাতে মন্দ চরিত্রের স্থলে উন্নত চরিত্র মাধুর্য ফুটে ওঠে।

রাগ সংবরণ করা ও ক্ষমা করা মুত্তাক্বীন ও খোদা তা'আলার বান্দার পরিচয়। রাগ বলতে বুঝায়, অভ্যন্তরের উত্তাপ প্রকাশ করাকে। মানুষ যখন কোন আঘাত পায় এবং কষ্ট পায়, যেটার উপর সে স্বীয় আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তখন তার ভেতরে ভীষণ অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়। ওই অস্থিরতা ও অশান্তি থেকে উত্তপ্ত অবস্থাদির প্রসার ঘটে। এ প্রসার অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট সৃষ্টি থেকে সঞ্চারিত হয়। আর অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট সৃষ্টির মধ্যে শয়তান অন্যতম। বস্তুত রাগ, ক্রোধ, রোষ, গযব ও প্রতিশোধস্পৃহা, অধৈর্য্য হয়ে ওঠা, সহ্য শক্তি খর্ব করা, সহিষ্ণুতাকে চোখের আড়াল করা, ক্ষমা-মার্জনাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, ক্রোধ, রাগ প্রদর্শনের মডেল বনে যাওয়া- এ সবকিছু শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। সুনানে আবূ দাঊদ শরীফের বর্ণনানুযায়ী হযরত 'আত্বিয়্যাহ ইবনে ওরওয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: পরম সহিষ্ণু ও দূরদৃষ্টির মালিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

"ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আর শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, আগুনকে পানি দ্বারা নেভানো যায়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হয়, তবে সে যেন ওযূ করে নেয়।" [৭০]

অপর এক হাদিসে রাগ দমন করার জন্য অবস্থা ও পদ্ধতি পরিবর্তন করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। কেউ দন্ডায়মান হলে, বসে যাবে; বসে থাকলে, শুয়ে যাবে; শুয়ে থাকলে পার্শ্ব পরিবর্তন করে নেবে; যাতে শয়তানী প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায়।[৭১] হাদিসে সুস্পষ্টভাবে এ বাস্তবতাকে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে,

---

[৬৯] . সূরা আ-ল্-ই 'ইমরান, আয়াত: ১৩৪

[৭০] সুনান, আবূ দাঊদ, হাদিস নং- ৪৭৮৪

[৭১] মিশকাত, হাদিস নং- ৪৮৮০

শয়তানের সৃষ্টি আগুন থেকে, আগুনের চিকিৎসা পানি দ্বারা হয়, রাগ এলে ওযূ কর। ওযূ পবিত্রতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতার চিহ্ন। ক্রোধের সময় ভিন্ন অবস্থা তৈরী হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরীতে ক্রোধও নাপাকি, মলিনতা। আর অপবিত্র অবস্থায় ইবাদত-বন্দেগী করার পদ্ধতিগুলো অর্জন করা খুবই কঠিন, সুতরাং পবিত্রতা অর্জনে ওযূ করো। সেটা ইবাদত-বন্দেগীর নিকটে নিয়ে যায়, শয়তান থেকে দূরে নিয়ে যায়। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, আর শয়তানকে বর্জন করতে ওযূ করো; ক্রোধ শয়তানী অবস্থা, শয়তানী প্রভাবের চিকিৎসা করো। অবস্থার পরিবর্তন, পানি পান করা, নীরব থাকা, আউযুবিল্লাহ পাঠ করা, 'লা-হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করা এবং ওযূ করা সেটার চিকিৎসা।

ক্রোধ মানব শরীর ও ব্যক্তিত্বে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সর্বদা ক্রোধান্বিত অবস্থায় থাকা মানব হৃদয় ও স্নায়বিক অবস্থায় মন্দ প্রভাব ফেলে। আমেরিকান বিজ্ঞানী রেডফোর্ড বি উইলিয়াম বলেন: রাগ করার কারণে মানব হৃদয়ে এমনভাবে ক্ষতিসাধন হয়, যেমনিভাবে তামাক সেবন ও উচ্চ রক্তচাপ থেকে হয়। রাগান্বিত ব্যক্তি অতি দ্রুত মৃত্যুর উপত্যকায় পা রাখে। আর এতে সন্দেহ নেই যে, রাগ করার কারণে স্নায়বিক অবস্থার প্রসারণ সৃষ্টি হয়, মানুষের স্মৃতিশক্তিতে প্রভাব পড়ে, রাগ করার কারণে চেহারার উজ্জ্বলতা, ঠোঁট ও চোখযুগলের চমক হ্রাস পায়, পরিপাকতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হয়, এভাবে রাগ করার কারণে অগণিত ক্ষতি হয়ে থাকে। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: "ক্রোধ থেকে বিরত থাকো, কেননা সেটার শুরু উন্মত্ততা, আর সমাপ্তি লজ্জা ও অনুশোচনা।"[৭২] অপমান, লজ্জা, পেরেশানি থেকে সুরক্ষা পেতে ক্রোধ সংবরণ করা ও আত্মসংযম করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, অনেকসময় তাকে সারাজীবন সেটার ভোগান্তি সহ্য করতে হয়।

রাগ একটি অপারগতা ও দূর্বলতাও। হয়ত রাগের উত্তাপ প্রকাশকারী মনে করেন যে, আমি আমার শক্তি, সামর্থ্যের প্রকাশ করছি, বস্তুত সেটার বিপরীত হয়। রাগ তো সে দেখায়, যার মধ্যে সেটা সংবরণ ও নিয়ন্ত্রণের শক্তি নেই। যখন শক্তি, সামর্থ্য, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা কিছুই নেই, তাহলে রাগ একটি অপারগতা, একটি রোগ। এ রোগের চিকিৎসা করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। সেটা নিয়ন্ত্রণকারীকে বাহাদুর পলোয়ান আখ্যা দেয়া হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﷺلَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

"কোন ব্যক্তি কুস্তী দ্বারা পলোয়ান হয়না, বরং সে-ই প্রকৃত বীর, যে রাগের সময় নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারে।"

[বোখারী ও মুসলিম][৭৩]

ক্রোধ সংবরণ করা ও নিয়ন্ত্রণ করা শক্তি-সামর্থ্যের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করতে পারেনা, সে পলোয়ান নয়। ইমাম গাযযালী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: রাগ নিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংযম করতে পারা পুরুষত্বের আলামত। আর পুরুষত্ব শক্তি-সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ।

রাগ ও ক্রোধ সংবরণের হুকুম হাদিসে দেয়া হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: ﷺلا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: ﷺلا تَغْضَبْ

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করলেন,"আমাকে উপদেশ দিন!" তিনি বললেন, "তুমি রাগ করো না।" তিনি (লোকটি) এটা কয়েকবার আরয করলেন। তিনি (নবী করিম) প্রতিবারই বললেন: "তুমি রাগ করো না।"।

[বোখারী][৭৪]

রাগ দমন করার ব্যাপারে বারবার উপদেশ দেয়ার পেছনে অগণিত হিকমত রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, রাগের কারণে ভারসাম্য স্থির থাকে না, আর যখন ভারসাম্য ঠিক থাকে না, তখন দৃষ্টিভঙ্গি ও আক্বিদাগুলোতে অনিয়ম এসে পড়ে। এ অবস্থায় ঈমানের স্বাদও বিনষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই এরশাদ হচ্ছে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسَلَ "

---

[৭২] "إِيَّاكَ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ جُنُونٌ وَ آخِرَهُ نَدَمٌ"
عيون الحكم و المواعظ: ৯৬

[৭৩] সহীহ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৬১১৪
أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. . رقم
২৬০৯

[৭৪] . সহীহ বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ৬১১৬

“রাগ ঈমানকে তেমনিভাবে বিগড়ে দেয়, যেভাবে মুসাব্বর মধুকে বিনষ্ট করে দেয়। [৭৫]

ঈলুয়া তিক্ত বৃক্ষ, যার রসে অতিমাত্রায় তিক্ততা রয়েছে যে, সেটা মধুর মিষ্টতাকে পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়। তিনি এরশাদ করেছেন, মুসাব্বর মধুকে যেমনিভাবে নষ্ট করে দেয়, তেমনি ক্রোধ ঈমানকে নষ্ট করে দেয়। ক্রোধ সংবরণ করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল হয়। মুসলমান ক্রোধ পান করে তথা আত্মসংযম করে আল্লাহকে রাজি করার দিকে অগ্রসর হয়। মিশকাত শরীফে হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا تَجَرَّعَ رَجُلٌ جُرْعَةً أَفْضَلَ مِنْ غَيْظٍ يَكْظِمُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "

“কোন বান্দা আল্লাহ তা‘আলার দরবারে কোন ঢোক ওই রাগের ঢোকের চেয়ে উত্তম পান করেনি, যা বান্দা আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণের জন্য পান করছে।”

[শু‘আবুল ঈমান][৭৬]

ক্রোধ দমন করা উত্তম কাজ। ভালো ও কল্যাণের কাজ সেটিই, যা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা সন্তুষ্ট হয়ে যান। ইবনে জরীর ও ইবনে কাসির কর্তৃক বর্ণিত হাদিস লক্ষ্য করুন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ مِلَأَهُ اللهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا رواه ابْنُ جرير

অর্থ: যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্বীয় ক্রোধ ও গযবকে সংবরণ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও ঈমানের সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ করেন।[৭৭] মানুষের হৃদয়ে যখন প্রশান্তি, নিরাপত্তা, সন্তোষ অর্জিত হয়, তখন সর্বদিক থেকে তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। সে আধ্যাত্মিকভাবে এবং জাগতিকভাবেও পুরস্কৃত হয়। পার্থিব জীবনেও কল্যাণ লাভ করে, পরকালেও কল্যাণ অর্জন করবে। হাদিস শরীফে এসেছে,

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ

অর্থ: যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সংবরণ করে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে কিয়ামতের দিনে সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং জান্নাতের যেকোন হুর নিজের ইচ্ছেমতো বেছে নেয়ার অধিকার দান করবেন।” [ইবনে মাজাহ][৭৮]

এবার আসুন অন্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ইস্‌তিক্বামাত বা সঠিক পথে স্থিরতা

এক হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ - قَالَ: " قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাক্বাফী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন বিষয় বলুন, যা আপনার পরে সে সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করবো না।” আবূ উসামার হাদিসে ‘গায়রাকা’ (আপনি ব্যতীত) রয়েছে। তিনি এরশাদ করলেন: “বলো, আমি আল্লাহ’র প্রতি ঈমান এনেছি।” অতঃপর সেটার উপর স্থির থাকো। [সহীহ মুসলিম][৭৯]

একই বিষয়ে সুনানু ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: তোমরা সরল সোজা থাকো, কিন্তু তোমরা এটা করতে পারবে না। জেনে রাখো যে, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হচ্ছে সালাত, আর ওযূর হিফাযত মু’মিনই করে থাকে।[৮০]

ইসতিক্বামাত তথা স্থিরতার প্রাথমিক অবস্থা হলো, কর্মকান্ডে অলসতা হয় না; মধ্যম স্তরের ব্যক্তিদের ইসতিক্বামাত হচ্ছে, তারা আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এগুতে থাকে; আর ইসতিক্বামাতের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন পর্দা বা অন্তরাল থাকে না।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর মতে, ইসতিক্বামাত হচ্ছে, শিরক থেকে বেঁচে থাকা; হযরত ওমর

---

[৭৫] . শু‘আবুল ঈমান, হাদিস নং- ৭৯৪১, খন্ড: ১০, পৃ.- ৫৩১,

[৭৬] শু‘আবুল ঈমান, খন্ড-১০, পৃ.৫৩৮

[৭৭] তাফসীরে ইবনে কাসির, সূরা আল-ই ‘ইমরান (১৩০-১৩৬) ,খন্ড-০২, পৃ.১০৬

[৭৮] সুনানু ইবনে মাজাহ, বাবুল হিলম, হাদিস নং-৪১৮৬, খন্ড-০২, পৃ. ১৪০০

[৭৯] সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, بَابُ جَامِعِ أَوْصَافِ الْإِسْلَامِ , হাদিস নং- ৬২

[৮০] সুনানু ইবনে মাজাহ, كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا , بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ , হাদিস নং- ২৭৮

ফারুক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন, ইসতিক্বামাত মানে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের ব্যাপারে শিয়ালের মত যেন ছল চাতুরি (প্রতারণা) না করে; হযরত ইবনে আতার মতে তা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করা; হযরত বু'আলী জুরজানী বলেন, পদমর্যাদার প্রত্যাশা না করাই ইসতিক্বামাত; হযরত ওয়াসেতী বলেন, ইসতিক্বামাত হচ্ছে, ওই সকল স্বভাব ও চরিত্র, যেগুলোর মাধ্যমে মানবীয় সৌন্দর্য পূর্ণতা অর্জন করে; হযরত শিবলী বলেন, উপস্থিত সময়কে নিয়ামত মনে করেন যিনি, তিনি ইস্তিক্বামাতসম্পন্ন ব্যক্তি। [তাহযীবু মাদারিজিস সালিকীন,পৃ. ৫২৭-৫২৮]

ইমাম ক্বুশায়রী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ইসতিক্বামাত-এর তিনটি স্তর রয়েছেঃ এক. কথাবার্তায় ইসতিক্বামাত হচ্ছে, মুখে গীবত না আসা; দুই. কাজকর্মে ইসতিক্বামাত হলো, মানুষ বিদ'আতের নিকটেও যাবে না; তিন. আমলের ইসতিক্বামাত মানে অলসতা ত্যাগ করা।

[রিসালাহ-ই ক্বুশায়রিয়াহ, বাবুল ইসতিক্বামাহ, পৃ.১৮২]

ক্বোরআনুল কারীমে ইসতিক্বামাতসম্পন্ন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মহাপুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:- তাঁদের প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়, দুনিয়াতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে নিষ্কৃতি দেয়া, আখেরাতে দুশ্চিন্তা, অবমাননা, পেরেশানী থেকে পরিত্রাণ দেয়া, জান্নাতের সুসংবাদ, পার্থিব জীবনে খোদায়ী সাহায্যপ্রাপ্তির অঙ্গীকার, পরকালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে বন্ধুত্ব, আত্মার সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ, প্রতিটি চাহিদার পূর্ণতা এবং পরম ক্ষমাশীল, করুণাময়ের বিশেষ আতিথেয়তা। [হা-মীম সাজদাহ্, ৩০-৩৩]

সুফীগণের মতে, ইসতিক্বামাত সমস্ত কারামত থেকে সর্বোত্তম। ইমাম গাজ্জালী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন: ইসতিক্বামাত-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সর্বাধিক কঠিন কাজ। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ও বড় বড় মনীষীদের বাণী থেকে যে কথা প্রতিয়মান হয়, সেটা হলো ইসতিক্বামাত'র প্রথম সম্পর্ক আক্বিদাহ ও ঈমানের সাথে। ইসলামে আক্বিদাহার নিসাব সুনির্দিষ্ট– তাওহীদ, রিসালতের ঈমান, ঐশীগ্রন্থাবলির ঈমান, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ঈমান, হাশর-নশর'র ঈমান। আক্বিদাহ ও ঈমানের দিকগুলো সুনির্ধারিত, এগুলোর মধ্যে নড়বড়ে না হওয়া-ই ইসতিক্বামাত। আমলের মধ্যে ইসতিক্বামাত হলো, আমলের স্থায়িত্ব, ফরয ও সুন্নাত হুকুমগুলোর উপর আমল করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। রুহানিয়ত তথা আত্মিক ইসতিক্বামাত হচ্ছে, স্বভাবের বৈচিত্র থেকে মুক্ত থেকে সর্বাবস্থায় একই রূপে থাকা।

রিসালাহ-ই ক্বুশায়রিয়াহ-তে সংকলক হযরত জোনায়দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)'র সূত্রে একটি হৃদয়স্পর্শী রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি একদিন জঙ্গলের দিকে ঘুরতে বের হলাম, সেখানে একটি বাবুল গাছের নিচে এক যুবকের সাথে সাক্ষাত হলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কেন বসে আছো? সে বলল, আমার এক 'হালত' (অবস্থা) ছিল, সেটা হারিয়ে গেছে। পরে তাকে সেখানে রেখে আমি প্রত্যাবর্তন করলাম। ইত্যবসরে আমি হজ্জব্রত পালন করে ফিরে এসে দেখলাম সে যুবক তখনও ওই গাছের নিচে বসে আছে। পুনরায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এখনো এ স্থানে বসে আছো, মূলত: কেন? সে প্রত্যুত্তরে বলল, আমি যে বস্তুর খোঁজ করছিলাম, সেটা আমি এ স্থানে পেয়ে গেছি। সুতরাং আমি এখানেই স্থির হয়ে বসে গেলাম। হযরত জোনায়দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি অবগত হতে পারি নি, তার দু অবস্থার মধ্যে কোনটি উত্তম ছিল। একটি অন্বেষণকালীন অবস্থা, অপরটি উদ্দিষ্ট বস্তু অর্জিত হওয়ার পর এখানেই স্থির হয়ে যাওয়া। [রিসালাহ-ই ক্বুশায়রিয়াহ, বাবুল ইসতিক্বামাহ, পৃ.১৮৪]

ওইসব ব্যক্তি, বড় উন্নত সৌভাগ্যবান হন, যারা হাক্বীক্বত অন্বেষণ করে; আর প্রকৃত কাঙ্ক্ষিত পরশমণি তার কোলে এনে দেয়। সুতরাং সেটা নিয়ে তাঁরা স্থির হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইস্তিক্বামাত তথা স্থিরতার কল্যাণ নসীব করুন। আমীন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

লেখক: পরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও ফজিলত

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরী

একজন বান্দা পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনে যতবার রমজান মাস পাবে ততবার রমজান মাসের রোযা ফরজে আইন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর হতে জীবনের শেষ পর্যন্ত নামায পড়া ফরজে আইন। ইসলামী শরীয়তে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ফরজ ইবাদত। এগুলো ছাড়া নফল ইবাদতও রয়েছে। যেমন নফল নামাযের ইবাদত নফল যাকাতের ইবাদত, নফল রোযার ইবাদত এবং নফল হজ্বের ইবাদত। ফরজ ইবাদতগুলো বান্দাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। এগুলোতে কোন ছাড় নেই। তবে নফল ইবাদত ফরজের মত আবশ্যক না হলেও এগুলোর অনেক ফজিলত রয়েছে। নিম্নে নফল ইবাদতের গুরুত্ব, ফজিলত এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি ইনশা-আল্লাহ্।

১. নফল হলো ফরজের ঘাটতি ও অসম্পূর্ণতার পরিপূর্ণতা

মিশকাতুল মাসাবীহ-এর ১১৭ পৃষ্ঠার একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اوّل ما يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القيامة مِنْ عمله صلوته فان صلحت فقد افلحو انجح وأن فسدت فقد خاب وخَسِرَ فان انتقص مِنْ فَريضة شىء قال الرب تَبَارَكَ و تعالى اُنْظُرُوْا هل لِعَبْدِىْ من تطوّع فليكمّلُ بها ما انتقض من الفريضة ثم يكونُ سائر عمله على ذالك-

অনুবাদ:‘‘হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম বান্দার আমল হতে নামাযের হিসেব করা হবে। যদি নামায সঠিক-শুদ্ধ হয় তাহলে সে সফল ও কামিয়াব হবে। আর যদি নামায সঠিক শুদ্ধ না হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং যদি তার ফরয হতে কোন কিছু কমতি হয়। অর্থাৎ- ফরজের পরিপূর্ণতা কম হয় সুন্নাত ও মুস্তাহাব অনাদায়ের কারণে তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা’আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, তোমরা দেখ আমার এ বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা, যদি কোন নফল নামায থাকে, তাহলে ওইগুলোর মাধ্যমে পূরণ করা হবে ফরজের ঘাটতি থাকলে, তারপর এভাবে তার সকল আমল পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ- ফরজ যাকাতের ঘাটতি নফল সাদকা দ্বারা এবং ফরজ রোযার ঘাটতি নফল রোযা দ্বারা এবং ফরজ হজ্বের অসম্পূর্ণতা নফল হজ্ব দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে। অতঃপর তাকে পাশ দেওয়া হবে।’’ অতএব, অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা গেলে যে, ফরয নামায, ফরজ যাকাত, ফরজ রোযা ও ফরজ হজ্ব আদায়ে সুন্নাত, নফল, মুস্তাহাব আদায় না করার কারণে যে ত্রুটি বিচ্যুতি এবং কমতি ঘাটতি হয়ে বান্দা ফরজ ইবাদতে পাশ না পেলে নফল ইবাদত দ্বারা সে কমতি-ঘাটতির কাফ্ফারা ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে ফরজ ইবাদতে বিচার দিবসে পাশ দেওয়া হবে। আখিরাতে হিসেব-নিকাশের কঠিন মুহূর্তে নফল ইবাদতই অনেক কাজে আসবে। তাই দুনিয়ায় আমাদেরকে ফরজের আগে ও পরে মহব্বত সহকারে নফল ইবাদতগুলো আদায় করতে হবে।

২. নফল ইবাদতের মাধ্যমে ফরজের একাগ্রতা সৃষ্টি হয়

ফরজ নামাযের পূর্বে নফল নামায দ্বারা বান্দা দুনিয়া হতে আলাদা ও পৃথক হয়ে যায়। বান্দা এ নামাযের মাধ্যমে দুনিয়া হতে বিমুখ হয় আল্লাহ্ মুখী হয়ে যায়। বান্দার মধ্যে এক ধ্যান, এক খেয়াল সৃষ্টি হয়। ফলে বান্দা একমাত্র আল্লাহ্‌র ধ্যান ও খেয়াল সহকারে ফরজ আদায়ে সক্ষম হয়। কেননা আল্লাহর ধ্যান ছাড়া নামায হয় না।

যেমন-আল্লাহ্‌র হাবীব বলেন- لاصلوة الابحضورالقلب একাগ্রচিত্ততা ব্যতীত নামায হয় না।)

৩. নফল নামাযের মাধ্যমে ফরজের ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হয়

হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ফরজ নামাযের পর নফল নামায (ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতীত সবগুলো নফল) এর মাধ্যমে ফরজ আদায়ে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় সেগুলোর কাফ্ফারা তথা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। তাই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ফরজের পর সুন্নাত নামায ও নফল নামায দান করেছেন।

৪. নফলের পরিচয়

বাহারে শরীয়তের ১ম খন্ডের ২৮৬ পৃষ্ঠায় 'রদ্দুল মুহতার' ফতোয়ার কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, নফল শব্দটি ব্যাপক। এটি (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং সুন্নাতে যায়েদা) এর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং মুস্তাহাবের জন্যও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং নফল নামায মানে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ এবং সুন্নাতে যায়েদা ও নফল, মুস্তাহাব সকল নামায নফলের অন্তর্ভুক্ত। অতএব ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতীত সবগুলো নফল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ হলো বার রাকাত। ফজরের ফরজের পূর্বে দু'রাকাত, যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত এবং ফরজের পর দু'রাকাত, মাগরিবের ফরজের পর দু'রাকাত, এবং এশার ফরজের পর দু'রাকাত। অবশিষ্টগুলো সুন্নতে যায়েদা এবং নফল। জুমার দিন জুমা আদায়কারীর জন্য জুমার ফরজের পূর্বে চার রাকাত, পরে চার রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। অবশিষ্টগুলো সুন্নতে যায়েদা এবং নফল।

৫. কিছু নফল নামাযের ফজিলত

ক. তাহিয়্যাতুল অযুর নামায: অযু করার পর অযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। [বাহারে শরীয়ত]

সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি, অযু করে এবং উত্তম রূপে অযু করে এবং পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে দু'রাকাত নামায পড়ে তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যায়।" উল্লেখ্য যে, গোসলের পরও দু'রাকাত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব।

খ. তাহিয়্যাতুল মসজিদ: যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদে বসার পূর্বে দু'রাকাত (বরং উত্তম হলো চার রাকাত) নামায পড়া সুন্নত। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আবু কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকাত নামায পড়ে।" যদি কোন ব্যক্তি এমন সময়ে মসজিদে আসে যে সময়ে নামায পড়া মাকরূহ। যেমন সুবহে সাদিকের পর এবং আসরের ফরজ নামাযের পর তখন তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়বে না। বরং তাসবীহ, তাহলীল ও দরূদ শরীফ পড়বে। তাহলে মসজিদের হক আদায় হয়ে যাবে। [বাহারে শরীয়ত]

গ. ইশরাকের নামায: তিরমিযী শরীফে এসেছে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে পড়ে, আল্লাহর জিকির করতে থাকে-এভাবে যখন সূর্য উদয় হয়ে কিরণ উজ্জ্বল হয় তারপর দু'রাকাত নামায পড়ে, তাহলে সে ব্যক্তি পূর্ণ এক হজ্ব এবং এক ওমরার সওয়াব পাবে।

ঘ. চাশতের নামায: চাশতের নামায কমপক্ষে দু'রাকাত এবং উর্ধ্বে বার রাকাত। উত্তম হলো বার রাকাত।

[বাহারে শরীয়ত]

হাদীস শরীফে এসেছে যে লোক চাশতের বার রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে স্বর্ণের মহল নির্মাণ করবেন।

ঙ. সালাতুল আওয়াবিন: মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। [বাহারে শরীয়ত]

এ নামায দু'রাকাত পর পর সালাম ফেরানোর মাধ্যমে অর্থাৎ এক নিয়তে দু'রাকাত পড়া উত্তম।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بَعْدَ المغرب ستّ ركعاتٍ لم يتكلم فيما بينهن بسوء عُدِلْنَ له بِعِبَادِةِ تفتى عَشْرَةَ سنة رواه الترمذى-

" হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাত নামায পড়বে, সেগুলোর মধ্যে কোন খারাপ ধ্যান না করে তাহলে তাকে বার বছরের ইবাদতের সওয়াব দান করা হবে।" হাদীস খানা ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। [মেশকাতুল মসাবিহ: ১০৪পৃষ্ঠা]

চ. তাহাজ্জুদের নামায: তাহাজ্জুদের নামায কমপক্ষে দু'রাকাত এবং আট রাকাত পর্যন্ত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে।

[বাহারে শরীয়ত]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম হতে জাগ্রত হয় এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগ্রত করে এর পর উভয়ে দু-দু'রাকাত করে নামায পড়ে- তাহলে তাদেরকে বেশি বেশি ইবাদতকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। হাদীস খানা ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা স্বীয় সুনানে এবং ইমাম ইবনে হীব্বান স্বীয় সহীহে ও হাকেম স্বীয়

মুসতাদরকের মধ্যে সংকলন করেছেন এবং ইমাম মুনজের বলেছেন এ হাদীসটি শায়খাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ।

[রদ্দুল মুহতার এবং বাহারে শরীয়ত]

৬. নফল রোযার সন্ধান ও ফজিলত

ক. মহর্‌রমের ৯ ও ১০ তারিখ কিংবা ১০ ও ১১ তারিখের রোযা। হাদীস শরীফে এসেছে এ রোযা পূর্বের এক বছরের পাপ মোচন করে দেয়।''

খ. আরফার দিন অর্থাৎ জিলহজ্বের ৯ তারিখের রোযা। হাদীস শরীফে এসেছে- "এ রোযা পূর্বের এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের পাপ মোচন করে দেয়।

গ. শাওয়ালের ছয় রোযাঃ হাদীস শরীফে এসেছে, ''যে শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখল সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।

ঘ. শাবান মাসের রোযাঃ হাদীস শরীফে এসেছে, "রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখতেন। প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি শাবান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন, শাবানের প্রতি দিন বান্দার নেক আমল আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ হয় আর আমি চাই এমন অবস্থায় আমার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ হোক- যে অবস্থায় আমি রোযাদার।"

ঙ. প্রতি মাসে তিনটি রোযাঃ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ তিনটি রোযা রাখা মুস্তাহাব। এ তিনটি রোযা আদম আলায়হিস্ সালাম রেখে আলোকিত ও শুভ্র হয়েছেন। সেজন্য এগুলোকে صيام ايام بيض সাদা দিবসের রোযা বলা হয়। হাদীস শরীফে এসেছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''যে ব্যক্তি প্রতি চন্দ্র মাসে এ তিনটি রোযা রাখল সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।''

চ. প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবারের রোযাঃ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, ''রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে খেয়াল করে রোযা রাখতেন।"

হযরত আবু কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে পাককে প্রশ্ন করা হলো সোমবারের রোযা রাখার কারণ কী? তিনি উত্তরে বলেন, ''সেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং আমার উপর প্রথম ওহি নাযিল হয়েছে।''

ছ. যে কোন একদিনের রোযা

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ صَامَ يَوْمًا فى سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سَبْعِيْنَ خريفًا مفق عليه-

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে একদিন রোযা রাখবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের দূরত্বে করে দেবেন।

[বুখারী ও মুসলিম শরীফ এবং মিশকাতুল মসাবিহ্ঃ ১৭৯ পৃষ্ঠা]

৭. নফল সাদকার গুরুত্ব

হাদীস শরীফে এসেছে প্রতিদিন প্রত্যুষে দু'জন ফেরেশতা দুনিয়ায় অবতরণ করেন। একজন বলেন, হে আল্লাহ্ দানশীল ব্যক্তির সম্পদ বাড়িয়ে দিন। আরেক জন বলেন, হে আল্লাহ্! কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করে দিন।

অপর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর আমি তোমাকে দেব।[হাদীস কুদসী]

অপর বর্ণনায় এসেছে নবীজি বলেন, যে ব্যক্তি তার সম্পদ ও আয়ু বৃদ্ধি হওয়া চায় সে যেন তার রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। অর্থাৎ তাদেরকে সাহায্য ও দান করে। অতএব, ফরজ যাকাত তো অবশ্যই আদায় করতে হবে এর মধ্যে কোন ছাড় ও শিথিলতা নেই। তবে এ ফরজ যাকাত আদায়ের সাথে সাথে কিছু নফল দান-সাদকা করতে হবে। নফল দান-সাদকার বহু ফজিলত রয়েছে। দানের মাধ্যমে বান্দাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হতে পারে।

ছ. নফল হজ্বঃ ফরজ হজ্ব তো অবশ্যই আদায় করতে হবে। তবে এ ফরজ হজ্ব আদায়ের পর তাওফিক অনুযায়ী নফল হজ্ব করতে হবে। হাদীসে কুদছির মধ্যে এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, "আমি যাকে দু'টি নেয়ামত দান করেছি অর্থাৎ সুস্থতা এবং সম্পদ সে জন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আমার ঘরের হজ্ব করে।" এ হজ্বের মাধ্যমে অতীত জীবনের গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় এবং দুনিয়ায় থাকতে বেহেশতের সার্টিফিকেট অর্জন হয়। যেমন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন-

الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة-

৯. নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করে

হাদীসে কুদসীর মধ্যে এসেছে- নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে বান্দাহ্ আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। অর্থাৎ বান্দাহ্ যত নফল ইবাদত করে তত আল্লাহ্ তা'আলার কাছাকাছি হয়। যত নফল নামায, নফল রোযা, নফল হজ্ব, নফল দান-সাদকা করে ততই আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী হতে থাকে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালোবাসা দান করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা সে ভালোবাসা প্রাপ্ত ব্যক্তির চোখ হয়ে যান- সে চোখ দিয়ে সে দেখে, তার কান হয়ে যান সে কান দিয়ে সে শুনে, তার জিহ্বা হয়ে যান, সে জিহ্বা দিয়ে সে কথা বলে। তার হাত হয়ে যান, সে হাত দিয়ে সে ধরে, তার পা হয়ে যান সে পা দিয়ে সে হাঁটে। অর্থাৎ তার চোখ, কান, জিহ্বা, হাত ও পায়ে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া শক্তি চলে আসে।

তরিকতের একটি উক্তি উল্লেখ করে লেখাটার ইতি টানতে পারি। উক্তিটি হলো- الفَرْضُ عَلَيْكَ والنفل لك অর্থাৎ- ফরজ তোমার উপর আবশ্যক এবং নফল তোমার উপকার ও কল্যাণের জন্য। অর্থাৎ- ফরজ ইবাদত তথা ফরজ নামায, ফরজ যাকাত, ফরজ রোযা এবং ফরজ হজ্ব তো অবশ্যই আদায় করতে হবে, এটি বান্দার মৌলিক দায়িত্ব। আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করা তার জন্য হালাল হয়। এটি ছাড়া আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করা হারাম। [খাজা গরীব নাওয়ায]

ফরজ আদায় না করলে আল্লাহ্ তা'আলার জিম্মাদারী থাকে না। এ ফরজ আদায়ে বান্দার কৃতিত্ব নেই। বান্দার কৃতিত্ব হলো নফল আদায়ে। এ নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর প্রিয় হয় এবং বেলায়ত অর্জন করে আল্লাহর অলি হয়। নফল ইবাদত ছাড়া বেলায়ত অর্জন সম্ভব নয়। যারা অলি হয়েছেন তারা নফল ইবাদতের মাধ্যমে অলি হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নফল ইবাদত করার তাওফিক দান করুন- আমীন। বেহুরমতি সায়্যিদিল মুরসালিন।

আরবী বর্ণের যথাযথ বাংলা প্রতিবর্ণায়ন বিলুপ্তির পথে

বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রে ইসলামী পরিভাষা ও মুসলিম ঐতিহ্য

মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার

আরবী, ফার্সী ও উর্দূ বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন ও উচ্চারণ

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন দুনিয়ায় তার একত্ববাদ ও নবী-রসূলগণের নুবূয়ত ও রিসালত প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে হযরত 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল আলাইহিমুস্ সালাম প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদের খোদা প্রদত্ত জ্ঞান ও তাঁদের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও সাহীফাহ্র আলোকে স্ব স্ব যুগে নিজ নিজ এলাকা ও সম্প্রদায়সহ মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ্র ওয়াহ্দানিয়াতের দা'ওয়াত তথা দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। পরিশেষে ইসলামের পূর্ণতায় সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ করা হয় কুরআন মাজীদ। এ জন্যই ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জীবন-জীবিকাসহ সবকিছুতে কুরআন-সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে হবে এবং মানুষকে আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন ইসলামের আদর্শের আহ্বান করতে হবে।

পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি। সকলের ভাষাও তাঁর সৃষ্টি। তবে মানব জাতির পথপ্রদর্শনের মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয় আরবী ভাষায়। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তিন কারণে আরব ও আরবী ভাষাকে ভালবাসবেঃ কেননা আমি আরাবী (আরবীভাষী), কুরআন মাজীদের ভাষা আরবী এবং জান্নাতবাসীর ভাষা আরবী'। তাই পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানদের মাতৃভাষা এবং নিজস্ব আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় ভাষার পাশাপাশি কুরআনের ভাষা আরবী হওয়ায় বিশ্ব মুসলিমের একক মৌলিক ভাষা হল আরবী। মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইহকাল সমাপ্তির পর পরকাল শুরুর মধ্যবর্তী সময় আলমে বারযাখ। অর্থাৎ কবরের ভাষা হবে আরবী। নাশ্র, হাশ্র, জান্নাতের ভাষাও হবে আরবী। তাই মৃত্যুর সাথে সাথে সকল মানুষের স্ব স্ব মাতৃভাষা বিলুপ্ত হয়ে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

আরবীতে শাব্দিক প্রতিশব্দ, পরিভাষা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আরবী ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও ব্যাপক অর্থবহ। সুতরাং এ ভাষার শুদ্ধ ও যথাযথ উচ্চারণ অতীব জরুরী। এর উচ্চারণ যথাযথ না হলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই শব্দের উচ্চারণ ও লিখন যথাসম্ভব সাহীহ্-শুদ্ধ হতে হবে। আরবী বর্ণ, শব্দ ও বাক্য অন্য যে কোন ভাষায় উচ্চারণে ও লিখন হুবহু বা একেবারে যথাযথভাবে সম্ভবপর নয়। এটা আরবী ভাষার অলৌকিকত্ব। তবুও আরবী ভাষার সঠিক উচ্চারণ ও বর্ণায়ন ইত্যাদিতে কিছু কিছু নীতি অনুসরণে এর স্বাতন্ত্র্য কিছুটা হলেও বজায় থাকে। যেমন-বাংলায় আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণ হবে আলিফ-অ, হাম্যাহ্-অ, বা-ব, তা-ত, তা তানীস-ত/হ, সা-স, জীম-জ, হা-হ্, খা-খ, দাল-দ, যাল-য, রা-র, ঝা-ঝ, সীন-স, শীন-শ, সোয়াদ-স, দ্বোয়াদ-দ্ব, ত্বোয়া-ত্ব, যোয়া-য, 'আইন-'আ, গাইন-গ, ফা-ফ, ক্বাফ-ক্ব, কাফ-ক, লাম-ল, মীম-ম, নূন-ন, হা-হ, ওয়াও-ও/উ/ভ, ইয়া-য়/ই। হরকত সহকারে উচ্চারণ হবে হাম্যাহ্-আ/ই/উ, বা-বা/বি/বু, তা-তা/তি/তু, সা-সা/সি/সু, জীম-জা/জি/জু, হা-হা/হি/হু, খা-খা/খি/খু, দাল-দা/দি/দু, যাল-যা/যি/যু, রা-রা/রি/রু, ঝা-ঝা/ঝি/ঝু, সীন-সা/সি/সু, শীন-শা/শি/শু, সায়াদ-সা/সি/সু, দ্বায়াদ-দ্বা/দ্বি/দ্বু, ত্বায়া-ত্বা/ত্বি/ত্বু, যোয়া-যা/যি/যু, 'আইন-'আ/'ই/'উ, গাইন-গা/গি/গু, ফা-ফা/ফি/ফু, ক্বাফ-ক্বা/ক্বি/ক্বু, কাফ-কা/কি/কু, লাম-লা/লি/লু, মীম-মা/মি/মু, নূন-না/নি/নু, ওয়াও-ওয়া/ভি/ভু, হা-হা/হি/হু, ইয়া-ইয়া/ই/ইউ। যতি চিহ্ন ব্যবহারে কুরআন মাজীদের 'মাজ্‌রেহা'য় 'রা' বর্ণের 'যের' হারকাতের উচ্চারণে ও লিখনে এ-কার (ে) হবে। এছাড়া সকল 'যের' উচ্চারণে ও লিখনে হ্রস্ব ই-কার (ি) হবে। যেমন কিতাব, ফিক্বহ্, মিহ্‌রাব ইত্যাদি বর্ণে হবে হ্রস্ব-ই। যেমন 'ইবাদাত, ইখলাস, ইনক্বিলাব ইত্যাদি। 'যের'-এর পর সাকিন বিশিষ্ট 'ইয়া' থাকলে উচ্চারণে ও লিখনে দীর্ঘ ঈ-কার (ী) হবে।

যেমন মীলাদ, মীযান, জীলান ইত্যাদি। বর্ণে হবে দীর্ঘ-ঈ। যেমন ঈমান, ‘ঈসা, ‘ঈদ ইত্যাদি। শব্দের শেষ বর্ণ সাকিনযুক্ত ইয়ায়ে মা‘রূফ হলে দীর্ঘ-ঈ কার হবে। যেমন মুহাম্মাদী, হাবীবী, হানাফী ইত্যাদি। ‘যবর’ উচ্চারণে ও লিখনে আ-কার (া) হবে। যেমন মান্নান, গাফ্ফার, সাত্তার ইত্যাদি। ‘পেশ’ উচ্চারণে ও লিখনে হ্রস্ব উ-কার (ু) হবে। যেমন মুহাম্মাদ, মুস্ত্বাফা, মুখ্তার ইত্যাদি। বর্ণে হবে হ্রস্ব-উ। যেমন ‘উমার, ‘উসমান, ‘উবাইদ ইত্যাদি। অবশ্য, ‘আইনকে হলকে উচ্চারণ করতে এর কাছাকাছি ওমর, ওসমান, ওবায়দও লিখা ও পড়া যাবে। ‘পেশ’-এর পর সাকিন বিশিষ্ট ‘ওয়াও’ থাকলে দীর্ঘ উ-কার (ূ) হবে। যেমন নূর, হূর, হূদ ইত্যাদি। বর্ণে হবে দীর্ঘ-ঊ। যেমন ঊলা, ঊদ, ঊর ইত্যাদি।

ফার্সী ও উর্দূ বর্ণমালায় আরবী বর্ণের অতিরিক্ত ৮ টি বর্ণ রয়েছে। এগুলোর প্রতিবর্ণ হবে পে-প, টে-ট, চে-চ, ডাল-ড, ড়ে-ড়, ঝে-য, গাফ-গ, ইয়ায়ে মাজ্হূল-এ। উচ্চারণ হবে পে-পা/পি/পু, টে-টা/টি/টু, ডাল-ডা/ডি/ডু, ড়ে-ড়া/ড়ি/ড়ু, ঝে-ঝা/ঝি/ঝু, গাফ-গা/গি/গু, ইয়ায়ে মাজহূল-এ। ফার্সী ও উর্দূ শব্দের শুরুর যের উচ্চারণে এ অথবা এ-কার হবে। যেমন ফেরেশ্তা, বেহেশ্ত, মেহ্মান, মেজ্বান, মেহেরবান ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় ইসলামী পরিভাষা

বাংলা ভাষা বাংলাদেশীদের প্রিয় মাতৃভাষা। সর্বস্তরে এর যথাযথ মর্যাদা ও সঠিকভাবে চর্চা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তবে বাংলাভাষী মুসলমানদের কিছু নিজস্ব ইসলামী পরিভাষা রয়েছে। যা প্রাচীনকাল থেকে বলনে ও লিখনে প্রচলিত। মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইসলামী পরিভাষার ব্যবহারও চালু রাখতে হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কেউ কেউ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বহুল প্রচলিত ইসলামী পরিভাষাগুলোর পরিবর্তে বাংলা অর্থ ব্যবহার করতে থাকায় ইসলামী ভাবধারা ক্রমে বিলুপ্তির পথে। যেমন আখিরাত-পরকাল, ইন্তিকাল-পরলোকগমণ, আসমান-আকাশ, ঈমান-বিশ্বাস, আওয়াজ-ধ্বনি, ভরসা-আস্থা, দা‘ওয়াত-নিমন্ত্রণ, মেজবান-ভোজ, মেহ্মান-অতিথি, যিয়াফত-কুলখানি, তিলাওয়াত-পাঠ, তা‘লীম-শিক্ষা, মুরুব্বী-গুরু, মুনাজাত-প্রার্থনা, গোরস্থান-কবরস্থান, শশ্মান, মরহুম-মৃত/প্রয়াত, কবর-সমাধি, দাফন-সমাহিত করো, লাশ-মরদেহ, রূহ-আত্মা, দু‘আ-আশির্বাদ, তক্বদীর-অদৃষ্ট, সাওয়াব-পূণ্য, গুনাহ্-পাপ, নাজাত-পরিত্রাণ, যামানাহ্-কাল, গ্রেফতার-বন্দী, মুশকিল-বিপদ, পরওয়া-ভয়, খালাসী-মুক্তি, তদ্বীর-চেষ্টা, ওহী-প্রত্যাদেশ, ক্বিয়ামত-বিচারদিবস, শবে বরাত-ভাগ্যরজনী, শবে ক্বদর-মর্যাদার রাত, শবে মি‘রাজ-মেরাজরজনী, গোশ্ত-মাংস, ক্বিসমত-ভাগ্য, তাওফীক্ব-সামর্থ, যমীন-ভূমি, দুনিয়া-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ময়দান-মাঠ, তারা-নক্ষত্র, রাত-রজনী, দিন-দিবস, মেসাল-উদাহরণ, ঠাণ্ডা-শীতল, গরম-উষ্ণ, পানি-জল, খোশবু-সুগন্ধি, শরীক-অংশ, শাদী-বিয়ে, ওয়ালীমাহ্-বৌভাত, খবর-সংবাদ, রহমত-দয়া, মাফ-ক্ষমা, খোশ্আম্দেদ্-স্বাগতম, মেহনত-পরিশ্রম, দোস্ত-বন্ধু, দুশমন-শত্রু, খোন-রক্ত, মদদ-সাহায্য, খয়রাত-ভিক্ষা, সহীহ্-শুদ্ধ, ওযর-আপত্তি, খেদমত-সেবা, ইবাদতখানা-নামাযেরস্থান, ইয়াতীমখানা-অনাথালয়, সফর-ভ্রমণ, রওয়ানা-যাত্রা, মুসাফির-আগন্তুক, হেফাযত-সংরক্ষণ, দখল-আয়ত্ব, হায়াত-আয়ু, জিন্দেগী-জীবন, শেফা-আরোগ্য, হাওয়া-বাতাস, গায়েব-অনুপস্থিত, হাযির-উপস্থিত, পয়দা-সৃষ্টি, ফায়দা-উপকার, আরযগুযার-নিবেদক, চাচা-কাকা ইত্যাদি। (যদিও এখানেও এ শেষোক্ত আরবী-ফার্সী পরিভাষাগুলো অনেকাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে)

আরো উদ্বেগের সাথে লক্ষ্যণীয়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রণীত পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলামী পরিভাষাগুলো বাদ দেওয়ায় মাদ্রাসায় শিক্ষার্জন করেও ভবিষ্যতে হয়ত ইসলামী ভাবধারার পরিভাষাগুলোর ব্যবহার থাকবে না। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজী, বাংলা, বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় আধিক্যের কারণে পবিত্র কুরআন-হাদীসের মৌলিক জ্ঞানার্জনের সহযোগী বিষয়গুলো হ্রাস পেয়েছে। এককালে আরবী তথা পবিত্র কুরআন-হাদীসের অর্থ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যম ভাষা ছিল ফার্সী ও উর্দূ। এ দু’ভাষায় পবিত্র কুরআন-হাদীসের তারজামাহ্, তাফসীর ও মতলব পরিপূর্ণভাবে হাসিল হয়। বাংলায় অনুবাদে পবিত্র কুরআন-হাদীসের যথাযথ উদ্দেশ্যগত অর্থ আদায় করা সহজতর হয় না। যেমন আরবী সালাত শব্দের ফার্সী বা উর্দূ ভাষায় অর্থ হল নামায, বাংলায় প্রার্থনা। আরবী সাওম অর্থ ফার্সী-উর্দূতে রোযা, বাংলায় উপবাস। আরবী ‘আব্দ অর্থ ফার্সী-উর্দূতে গোলাম বা বান্দাহ্, বাংলায় দাস ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার নিজস্ব স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য রক্ষায়ও সর্বদা আদি বাংলা ব্যাকরণ ও বর্ণবিধান অনুসরণে সচেষ্ট থাকতে

হবে। না হয় অশুদ্ধ ব্যবহার, ত্রুটি ও বিকৃত উচ্চারণে ও লিখনে বাংলা ভাষার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা হারিয়ে যাবে। তাই ইসলামী পরিভাষা চালু রাখার পাশাপাশি মাতৃভাষা বাংলার শুদ্ধ উচ্চারণ ও লিখনে স্ব স্ব অবস্থান থেকে সবাইকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

মুসলমান ছেলে-মেয়েদের ইসলামী নামের শুরু বা শেষে যুক্ত করা হচ্ছে বাংলা বা ইংরেজী নাম। ছেলেদের বাংলা নাম স্বপন, মিলন, বাদল, বাবুল, সুজন, রতন ইত্যাদি। মেয়েদের বাংলা নাম জ্যোৎস্না, স্বপ্না, রত্না, রূপা, আঁখি ইত্যাদি। ছেলেদের ইংরেজি নাম জুয়েল, প্রিন্স, জন, হ্যারি, নোবেল ইত্যাদি। মেয়েদের ইংরেজী নাম জেসি, মূন, সুইটি, রকসী, শেলী ইত্যাদি। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টির সেরা মর্যাদা দান করেছেন। অথচ কেউ কেউ বিদেশী সেবামূলক সংস্থা-সংগঠনের পদ-পদবী ধারণ করে নামের পূর্বে 'লায়ন' অর্থাৎ পশু লিখতে গর্ববোধ করে থাকেন।

মুসলিম পরিবারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে প্রথমে আযান-ইক্বামাতের মাধ্যমে তার দু'কানে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের বাণী পৌঁছানো হয়। ইসলামের পায়গাম ও দাওয়াতী বার্তা দ্বারা নবজাতকের জীবনের সূচনা করা হয়। হযরত হুসাইন ইবন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার সন্তান জন্ম নিবে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামাত দেবে। এতে শিশুরোগ তার ক্ষতি করতে পারবে না। হযরত সামুরাহ্ ইব্‌ন জুন্‌দুব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নবজাতক নিজ আক্বীক্বাহ্‌র সাথে বন্ধক থাকে। তার জন্মের ৭ম দিনে একটি পশু যবেহ্ করবে এবং নাম রাখবে আর মাথা মুণ্ডাবে। হাদীস শারীফে ইরশাদ হয়েছে, সন্তানের সুন্দর অর্থবোধক ইসলামী নাম রাখা উচিত। জীবন ও কর্মে নামের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নিরানব্বই নাম অতীব সুন্দর ও অর্থবহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লমের নামও অত্যন্ত প্রশংসিত, সুন্দর, অর্থবহ ও আকর্ষণীয়। তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয় ক্বিয়ামত দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও পিতার নামে ডাকা হবে। অন্য হাদীসে রয়েছে, তোমরা আমার (নবী) নামে নাম রাখ। অপর হাদীসে রয়েছে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম হল, 'আবদুল্লাহ্ এবং 'আবদুর রাহ্‌মান। তাই সন্তান ভূমিষ্ঠের পর অর্থবোধক ইসলামী নাম রাখাই উচিত। কাফির, মুশরিক, নাস্তিকদের নামানুসারে নাম রাখা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকের জাহেলী যুগের আপত্তিকর নাম পরিবর্তন করে সুন্দর ও যথার্থ অর্থবোধক নাম রেখেছিলেন।

স্কুল-কলেজের কোন কোন মুসলিম শিক্ষার্থী পরিবেশগত কারণে অজানা, অসাবধানতা, অবচেতনা বা উদারতা বা অসাম্প্রদায়িকতার নামে অমুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও উৎসব পালন করে থাকে। যেমন এপ্রিলফুল, নিউইয়ার পার্টি, হ্যালোইন পার্টি, ভ্যালেন্টাইন ডে, হ্যাগ ডে, কিস ডে, বার্থ ডে, বিদ্যাদেবীর বাণী অর্চনা ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্য ও কাব্য রচনায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, কায়কোবাদ, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, মুনশী মেহেরুল্লাহ্, ইব্রাহীম খাঁ, ফররুখ আহমদ, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রমুখের বহুমাত্রিক অবদান রয়েছে। তারা তাদের কাব্য-সাহিত্যে শব্দ গাঁথুনীতে আরবী, ফার্সী, উর্দূ তথা ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যকে ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধ করেছেন। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

লেখক : সাহিত্যিক, গবেষক ও সংগঠক।

যুগে যুগে মুসলিম অধিকার ঐতিহ্যের উত্থান-পতন

বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ্‌র কিছু অদূরদর্শী নিকটাত্মীয়ের ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতা ও পদলোভী সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের হঠকারি ভূমিকায় ১৭৫৭ সালে তার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শাসন ব্যবস্থা বৃটিশ বেনিয়াদের দখলে চলে যায়। তারা প্রায় দু'শ বছর ভারতবর্ষ শাসন-শোষণ করে। তখন থেকে এ দেশের মুসলমানরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ব্যবসা, বাণিজ্য, সরকারী চাকুরী ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হতে থাকে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পরবর্তীতে সূর্যাস্ত আইনে মুসলমানদের জমি জমা ও ধন-সম্পদ বেহাত হতে থাকে। দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব তাদের চেতনাহীন ও অনেকটা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জনগোষ্ঠিতে পরিণত করে। অনেকে স্বল্পমূল্যে বাস্তুভিটিও বিক্রি করে ভূমিহীন হয়ে পড়ে। ইংরেজরা মুসলিম স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার শর্তে কিছু দুর্বলচিত্তের মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল। কেউ কেউ মুসলিম স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে এবং শাসক গোষ্ঠির তোষামোদ করে সর্বোচ্চ কেরানী চাকুরী পেলেও মুসলিম চেতনা ও ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত উঁচু শিক্ষিত মুসলমানের সরকারী চাকুরী ছিল না। অবর্ণনীয় নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনার মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতি অনেকটা অভাবী ও অসহায় জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও অগণিত প্রতিবাদী মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও উলামা-মাশায়িখের শাহাদতের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব ও পশ্চিম দু'অঞ্চলের সমন্বয়ে 'পাকিস্তান'-এর স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে মুসলমানদের 'স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র' সৃষ্টি হয়। ফলে রাষ্ট্রিয়ভাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার পুনরুদ্ধার হয়। মুসলমানদের নামের শুরুতে 'শ্রী' লিখনের স্থলে 'মুহাম্মদ' লিখা শুরু হয়। এরপর আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৫ আগস্ট ভারত বর্ষের অবশিষ্ট বিশাল অঞ্চলের প্রদেশগুলো নিয়ে 'হিন্দুস্থান' স্বাধীন হয়। তখন থেকে নানা শর্ত সাপেক্ষে ভারতীয় মুসলমানরা সীমিত পরিসরে অধিকার ভোগ করে আস্‌লেও এদিকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের মাতৃভাষা 'বাংলা'কে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানে অসম্মতিসহ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর অসদাচরণ, দমন, পীড়ন ও পূর্ব-পশ্চিম উভয় অঞ্চলের নাগরিক অধিকার ও ভোটাধিকারে বৈষম্যনীতি ইত্যাদির প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। এক পর্যায়ে তা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নিলে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ' স্বাধীন হয়। ফলে মাতৃভাষা 'বাংলা' রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে। এক পর্যায়ে আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃতি অর্জন করে। এরপর থেকে এ দেশের বাংলাভাষী জনগণের স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এ দেশের সকল ধর্মের জনগণ সমঅধিকার ও ন্যায্যপ্রাপ্য ভোগের নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা পায়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বাঙ্গালী ও রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে বাংলাদেশী জনগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সদ্‌ভাব বজায় রেখে বসবাস করে আসছে। ইসলামের উদারনীতিও তাই। ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার, প্রাপ্য ও নিরাপত্তা প্রদানে দায়িত্বশীল। এরপরও উদ্বেগের সাথে লক্ষণীয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী চেতনাকে পরস্পর বিরোধী উপস্থাপন ও আখ্যায়িত করে ইসলামী চেতনায় বিশ্বাসীদের ঢালাওভাবে স্বাধীনতাবিরোধী আখ্যায়িত করে তাদের মৌলিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করা হয়নি তাও বলা যায় না। অথচ ইসলাম সবসময় আধুনিক, বর্ণবৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও সকল মানুষের কল্যাণকর ধর্ম। তাই অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও কেবল ইসলামের সামাজিক নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করে উদার মনে সুস্থ-স্বাচ্ছন্দ্যে পার্থিব জীবন যাপন করে যাচ্ছেন। তবে মুসলমানদের জন্য দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি লাভে ইসলামকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত পরিপূর্ণ জীবন বিধানরূপে গ্রহণ করতে হবে এবং ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। ইসলামের নীতি-আদর্শকে নিজের মধ্যে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাস্তবায়নে মুসলমানদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে সদা সচেষ্ট হতে হবে। কুরআন মাজীদে সূরাহ্‌ বাক্বারাহ্‌র ২০৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মু'মিনরা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' সূরাহ্‌ আল-ই 'ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র ধর্ম।' এজন্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে

মুসলমানদেরকে মানব রচিত কোন নীতি-আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ইবাদাত-বন্দেগীর সাথে সাথে মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতায় এবং ঐতিহ্য রক্ষা ও পরিচয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে। ইসলাম সবসময় আল্লাহ্‌র বিধান মতে মৌলিক বিশ্বাসের কর্মমুখী জীবনধারা। এজন্য ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে কোনভাবেই সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদিতা বা মৌলবাদিতা বলা যাবে না। মুসলমানদের জানাযার নামাযে বলতে হয়, 'আল্লাহুম্মা মান্ আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্য়িহি 'আলাল্ ইসলাম ওয়ামান্ তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু 'আলাল্ ঈমান'। অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ্ আপনি (আমাদের মধ্যে) যাকে জীবিত রাখবেন, ইসলামের উপর জীবিত রাখবেন এবং যাকে মৃত্যু দেবেন, ঈমানের সাথে মৃত্যু দেবেন'। এতে প্রতীয়মান হয়, মুসলমানদের ইসলাম পরিচয়ে বেঁচে থাকাতেই ঈমানের বহিঃপ্রকাশ।

ইসলাম আল্লাহ্‌র এমন এক ধর্ম বা মানুষের জীবন বিধান, যাতে রয়েছে অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার, নিরাপত্তা ও জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা। প্রত্যেক মুসলমানের কার্যকলাপে সর্বাবস্থায় ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও বোধ-বিশ্বাস থাকতে হবে। ইসলামী আদর্শের বিপরীতে অন্য কোন চেতনায় বিশ্বাসী হওয়ার সুযোগ নেই। কোন কোন মুসলমানের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, দর্শন ও আদর্শজ্ঞান চর্চা না থাকার সুযোগটা ইসলামবিদ্বেষীরা কাজে লাগায়।

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশ্বজনীন ধর্ম ও জীবন বিধান। তাই বিশ্বের মুসলমানদের জীবন জীবিকা ও আচার আচরণে ইসলামী অনুশাসন ও বিধি বিধান অনুসরণ করতে হয়। এজন্য প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকায় সর্বদা হালাল-হারাম, জায়িয-নাজায়িয, সত্য-অসত্য, শোভন-অশোভন মেনে চলা অপরিহার্য। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ঈমান-আক্বীদাহ্‌র পর নামায ফরয বা বাধ্যতামূলক আমল। এরপর রমযানের রোযা এবং আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় যাকাত ও হজ আদায় করা ফরয। পুরুষের দাঁড়ি রাখা, নামাযের সময় পরিস্কার ও শালীন পোশাক এবং টুপি-পাগড়ি পরিধান করা সুন্নাত। মহিলাদের সর্বদা মাথায় কাপড় ও মুখে নেকাবসহ শালীন পোশাক পরিধান ও পর্দা করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, মুসলিম নারীদের অনেক ক্ষেত্রে আবরু ও পর্দা রক্ষা করা হচ্ছে না। পুরুষদের অনেকে কারণ ছাড়াই টুপিবিহীন ও দ্রুততার সাথে নামায আদায় করে থাকেন। যা অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অনেকে নামায পড়েও, হজ করেও দাঁড়ি রাখায় গুরুত্ব দেন না। ছাত্র-যুবকদের অনেকে দাঁড়ি রাখলেও তা সুন্নাত অনুযায়ী নয়। চুল কাটা হচ্ছে নানা ধরনের কুরুচি, দৃষ্টিকটু ও অশালীনভাবে। যা সুন্নাতে রাসূলের অনুকরণে নয় বরং খেলোয়াড় ও চিত্রনায়কদের অনুকরণে। আদান-প্রদান করা হচ্ছে বাম হাতে। কথা বলার শুরুতে সালাম-মুসাফাহা এবং বিদায়ের সময় আল্লাহ্ হাফিয বলার প্রথা উঠে যাচ্ছে। স্কুল-কলেজের অনেক মুসলিম শিক্ষার্থীর ইসলামী জ্ঞান এবং পারিবারিক নৈতিক শিক্ষার অভাবে ভিন্ন সংস্কৃতিতে ধাবিত হচ্ছে। উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্যণীয়, মাদ্‌রাসার কিছু শিক্ষার্থীও তা অনুকরণ করে চলেছে। এক সময় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের অনুকরণে পায়জামা-পাঞ্জাবী ও টুপি পরিধান করত। বর্তমানে মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের অনুকরণে দৃষ্টিকটু চুল-দাঁড়ি রাখা ও প্যান্ট-শার্ট পরিধানে গর্ববোধ করছে। অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-সভ্যতা ও আচার-আচরণ সবকিছু থেকে ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের বিচ্যুতি ঘটানোর গভীর ষড়যন্ত্র যেন অবচেতনায় মুসলমানরাই বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সুতরাং ইসলামী তাহ্‌যীব-তামাদ্দুনের সুষ্ঠু বিকাশে, ইসলামী পরিভাষা সচল রাখতে, মুসলমানের সঠিক ও অর্থবহ ইসলামী নাম রাখতে, মুসলমানদের ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে, মুসলিম গৌরবোজ্জ্বল অবস্থার পুনরুদ্ধারে এবং আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণায়ন ও উচ্চারণ-লিখনে স্বকীয়তা বজায় রাখতে স্ব স্ব অবস্থান থেকে মুহাক্বক্বিক্ব 'উলামায়ে কেরাম, মাশায়িখে 'ইযাম, মুবাল্লিগে ইসলাম, মু'আল্লিমে দীন ও মিল্লাত, ইমাম-খতীব, ইসলামী গবেষক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক সকলের সমন্বিত ভূমিকা রাখা জরুরী।

লেখক : সাহিত্যিক, গবেষক ও সংগঠক।

আলো-আঁধারীর গোলকধাঁধা

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

আলো ও আঁধার এক নয় । সমানও নয় তারা । তাদের মাঝে তফাৎ রাত ও দিনের । খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে 'আলো' লিখতে লাগে দুই অক্ষর । 'আঁধার' লিখতে তিন । আলোর চেয়ে বড় তাই আঁধারের পরিসর । এ শুধু সংখ্যার পার্থক্য নয়, পার্থক্য আছে তাদের অবয়বে এবং চারিত্রেও । আলো স্পষ্ট ও দৃশ্যমান করে বস্তুকে । আর আঁধার তাকে ঢেকে দেয় কালো আবরণে । আলোর সবটুকুই আভরণ । এ আভরণ প্রকাশিত হয় তার ঔজ্জ্বল্যে । মাথার ওপর চন্দ্রবিন্দু ধারণ করেও আঁধার কাউকে আলোকিত করতে পারে না । বরং তা ঔজ্জ্বল্যকে মুছে দেয় । আলোর সাথে তার শত্রুতা চিরকালীন । আলোর জন্য সাধনার প্রয়োজন । আঁধার নিষ্ক্রিয়তার সাধারণ ও অনিবার্য ফল । আঁধারের জন্য প্রয়োজন নেই সাধনার কিংবা আরাধনার । বিনা আয়াসে তা সহজলভ্য । নিষ্ক্রিয় মানুষের জীবনে তাই আঁধারের আধিপত্য । এ আধিপত্য এতই নিবিড় ও ঘন যে মানুষ নিজের হাতকেও দেখতে পায় না ।

এ আধিপত্যকে যে মেনে নেয় আঁধারই হয়ে পড়ে তার নিয়তি । প্রকৃত মানুষের একমাত্র সাধনা হচ্ছে আঁধারকে প্রতিহত করা । আঁধারের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই-ই তাই মানুষের জীবন । এ আঁধার মনের, সমাজের, দেশের ও বিশ্বের । এ আঁধার অজ্ঞানের, অবিশ্বাসের এবং অন্ধ বিশ্বাসের । এ আঁধার সংস্কারের ও কুসংস্কারের । এ আঁধার অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অর্ধশিক্ষার । এ আঁধার অপশিক্ষার ও অপশক্তির । লাঠি দিয়ে এ আঁধার তাড়ানো যায় না । এ আঁধার তাড়াতে হয় আলো জ্বালিয়ে । এ আলো শিক্ষার, সুশিক্ষার । এ আলো জ্ঞানের । জ্ঞানের অপর নাম তাই আলো । এ আলো সত্যের ও আনন্দের । সত্য ও আনন্দের এ আলো জ্বালাতে হবে মানুষের মনে । তাহলেই দূর হবে মনের অন্ধকার । এ আলো জ্বালাতে হবে সমাজে, দেশে ও বিশ্বে । তাহলেই আলোকিত হবে মানুষ, মানুষের মন, মানুষের সমাজ ও দেশ । আলোকিত হবে বিশ্ব ।

কিন্তু আজকের দিনে মানুষ ভুগছে কুপমণ্ডকতায় । সে নিজের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব তুলে দিয়েছে কিছু বিপজ্জনক মানুষের হাতে । তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করছেন পৃথিবীর গতিপথ । তাঁরা ছক এঁকে দিচ্ছেন মানুষের সামনে । সে পথ ধরেই এগুতে হয় তাদের । এ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই । এ পথ একমুখী । একরোখাও বটে । তাই দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি মানুষ আর আজ নিজের চলার কক্ষপথ নির্ধারণ করতে পারে না । তাদের চলতে হয় ক্ষমতাধর সে সকল বিপজ্জনক মানুষের নির্দেশিত পথে । তাঁদের নির্দেশিত পথ আলোর পথ নয় । আঁধারের । কারণ আলোর উৎস আল্লাহ । আল্লাহ যার জন্য রাখেননি কোনো আলোর ব্যবস্থা তার জন্য কোনো আলো নেই । ছায়া পেতে হলে যেতে হবে বটগাছের ছায়ার নিচে । তেমনি আলো পেতে হলে ধাবিত হতে হবে আলোর উৎসের পানে । ক্ষমতাধররা সে উৎসের পানে ধাবিত নন । এমনকী এ বিষয়ে তাঁরা ভাবিতও নন । তাঁরা অভাবিতভাবে ধেয়ে চলছেন বিপরীত দিকে । তাঁরা মানবিক সমাজ গড়তে রাজি নন । তাঁদের সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু পারমাণবিক বিশ্ব গড়ে তোলা । তাঁরা বেছে নিয়েছেন মরণ ও মারণের পথ । এ পথ আলোর নয়, এ পথ আঁধারের ।

তারা আঁধারের পূজারী । আলোর দিশারী নয় । কারণ তারা আসল প্রভুকে ছেড়ে স্বীয় প্রবৃত্তিকে বসিয়ে দিয়েছে প্রভুর আসনে । এ প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে গিয়ে তারা হারিয়ে বসেছে আলোর রাজত্ব । তারা চোখ থাকতেও অন্ধ । কারণ তাদের অন্তরে জমাট বেঁধে আছে ঘনঘোর অন্ধকার । বস্তুত চোখতো অন্ধ হয় না অন্ধ হয় হৃদয় ।

মানুষ দাঁড়িয়েছে এখন মানুষের মুখোমুখি । মুখোমুখি মানে মোকাবিলা । মোকাবিলা মানে শক্তির মহড়া । কার বাহুতে কত বল তার বড়াই । আর শক্তির মহড়া মানে রক্তাক্ত লড়াই । এর সহজ সরল দর্শন হচ্ছে: 'তুমি মরে যাও , আমি বেঁচে থাকি ।'

সৃষ্টির আদিকাল থেকে এ পৃথিবী একাধারে মানুষের জয় ও পরাজয় দেখেছে । বিজয়ীর উল্লাস ও বিজিতের গ্লানি প্রত্যক্ষ করেছে । কিন্তু তাদের উভয়ের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষরা আজ কোথায়? তারা কি মাটির নিচে নয়? কুরআন মানুষের কাছে জানতে চাইছে: তোমরা তাদের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও কি?

[সূরা মারিয়াম, সূরা নং ১৯, আয়াত: ৯৮]

কিন্তু যাদের জন্য এ সাবধানবাণী তারা এর প্রতি কর্ণপাত করেনা । তারা শুনতে পায় না কালের কল্লোল । শুনতে পায় না কালের যাত্রাধ্বনি । তারা নিজেদের চারিদিকে বানিয়ে নিয়েছে নিজস্ব মৌচাক । তারা মেতে আছে নিজস্ব মৌতাতে । তারা ‘টেরা চোখে দিয়ে কাজল, নিজরূপে নিজে পাগল ।’

তারা না বোধ করে বিবেকের তাড়না, না শোনে আসমানী আহ্বান । তাদের বিবেক হয়ে পড়েছে মুমূর্ষু, কানে বাসা বেঁধেছে একরাশ বধিরতা । এ বধিরতাকেই ভাবছে তারা অহঙ্কারের উপাদান, আসমানী আহ্বানকে অবজ্ঞা করাই তাদের কাছে মনে হয় স্বাধীনতা । জীবন তাই তাদের কাছে লাগামহীন, মরণ তাদের জন্য চেতনার বিনাশ বিশেষ । বেপরোয়া ক্ষমতাধর মানুষের এ লাগামহীন জীবনবোধ সারা দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছে তাই প্রতিকারহীন জুলুমের রাজত্ব ।

এ জুলুমই হচ্ছে প্রকৃত অন্ধকার । প্রাকৃতিক অন্ধকার প্রাকৃতিক নিয়মেই অপসারিত হয় । রাত শেষে দিন আসে । এ আঁধার যত গাঢ় হয় প্রভাত তত এগিয়ে আসে । এটাই ফিতরত । কিন্তু জুলুমের অন্ধকার সহজে যায় না । তাকে অপসারণ করতে করতে হয় সংগ্রাম । এ সংগ্রামই মানুষের জীবন । মানুষ এখন সে সংগ্রামের পথ হতে হয়েছে বিচ্যুত ।

মানুষের এ বিচ্যুতি তাকে করেছে বিপথগামী । আঁধারের হাতে সে নিজেকে করেছে সমর্পণ । মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলেই জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে । বিপর্যয়ের দায়ভার তাকে তাই গ্রহণ করতে হয় । মানুষ স্বভাবতই চায় না বিপর্যস্ত হতে । কিন্তু আলোর সাধনা ব্যতিরেকে মানুষের যে যাপিত জীবন তাকে শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় এসে অধিগ্রহণ করে ।

এ বিপর্যয় হতে রক্ষা পেতে হলে তাকে করতে হবে আলোর সাধনা । শুধু বস্তুগত জ্ঞান এ আলোর সন্ধান দিতে পারে না । এমনকি বস্তুগত জ্ঞান মানুষের জন্য বিপদজনকও হতে পারে । তার প্রমাণ আমরা আমাদের চারপাশে অহরহ দেখতে পাই । জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির পরও মানুষ আজ পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে । সে এসে দাঁড়িয়েছে পারমাণবিক সন্ত্রাসের মুখোমুখি ।

এ সন্ত্রাস থেকে রক্ষা পেতে হলে মানবজাতিকে বস্তুগত জ্ঞানের পাশাপাশি ওহীলব্ধ আসমানী জ্ঞানের দারস্থ হতে হবে । কুরআন দেড় হাজার বছর পূর্বেই মানুষের কাছে এ জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে । এর প্রতি পিঠ ফিরিয়ে রেখে কখনোও সে প্রকৃত আলোর সন্ধান পাবে না । আঁধারের মাঝেই তাকে ঘুরপাক খেতে হবে । অনবরত, অবিরত । এ এক অনিবার্য গোলকধাঁধা ।

লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, ৩৬৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫ ।

বৈশ্বিক মহামারী : করোনা ভাইরাস

ডা. এ এস এম শওকতুল ইসলাম শওকত
এমবিবিএস (সিইউ), এমপিএইচ (আমেরিকা)
ডিপিটিআর (ইন্ডিয়া), পিজিটি-মেডিসিন (লন্ডন)
পিএইচডি-ফিজিক্যাল মেডিসিন (ফেলো)

উৎপত্তি

করোনা ভাইরাস এমন এক সংক্রমক ভাইরাস, যা আগে এত ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে ছড়ায়নি। এ ভাইরাসে বিশ্বব্যাপী প্রাণহানির সংখ্যা আজকের তথ্য মতে, ১৫ লাখ ৪৩ হাজার ছাড়িয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৬ কোটি ৭৫ লাখের বেশি। বাংলাদেশে মৃত্যু সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার এবং আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লাখ ৮২ হাজার। ভাইরাসটির আরেক নাম ২০১৯-এনসিওভি বা নোভেল করোনা ভাইরাস। করোনা ভাইরাসের অনেক প্রজাতি আছে। এর মধ্যে ছয়টি প্রজাতি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। তবে এটি নতুন ধরনের ভাইরাস। তাই এর সংখ্যা এখন সাতটি।

২০০২ সালে চীনে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া সার্স (সিভিয়ার এ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম) ভাইরাসে পৃথিবীতে ৮০৯৮ জন সংক্রমিত হয় এবং ৭৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেটিও ছিল এক ধরনের করোনা ভাইরাস। নতুন এ রোগকে প্রথমে নানাভাবে নামকরণ করা হয়েছিল। যেমন 'চায়না ভাইরাস', করোনা ভাইরাস', '২০১৯ এনকভ', 'ফনেটিক ভাইরাস' ইত্যাদি। চলতি সালের ফ্রেরুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' রোগটির আনুষ্ঠানিক নামকরণ করে 'করোনা ভাইরাস ডিজিজ ২০১৯'। সংক্ষেপে 'কোভিড-১৯'।

লক্ষণ

* রেসপিরেটরি লক্ষণ ছাড়াও জ্বর, কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাস সমস্যা। * ফুসফুসে আক্রমণ। * সাধারণত শুষ্ক কাশি ও জ্বরে উপসর্গের সূচনা। পরে শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা। * সাধারণত রোগের উপসর্গগুলো প্রকাশে গড়ে পাঁচ দিন সময় ।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ভাইরাসটির ইনকিউবেশন পিরিয়ড ১৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তবে কোন কোন গবেষকের মতে, এর স্থায়িত্ব ২৪ দিন পর্যন্ত হতে পারে। কারো মধ্যে যখন ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দেবে, তখন তার কাছে অবস্থানকারী মানুষদেরও সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। এমনও ধারণা রয়েছে, সুস্থ থাকার সময়ও দেহে ভাইরাস সংক্রমিত করতে পারে। প্রাথমিক উপসর্গে সাধারণ সর্দি, জ্বর ও ফ্লু'র সাথে সাদৃশপূর্ণ রোগ নির্ণয়ে দ্বিধাগ্রস্থ হওয়া স্বাভাবিক।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব অনেককে সার্স ভাইরাসের কথা স্মরণ করে দিয়েছে। যা ২০০০ সালের শুরুতে এশিয়ার অনেক দেশে প্রায় ৭৭৪ জনের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। নতুন ভাইরাসটির জেনেটিক কোড বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে,এটি অনেকটাই সার্স ভাইরাসের মত। এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মার্ক উলহাউস বলেছিলেন, 'আমরা যখন নতুন কোন করোনা ভাইরাস দেখি, তখন জানতে চাই এর লক্ষণগুলো কতটা মারাত্মক। এ ভাইরাসটি অনেকটা ফ্লুর মত, তবে সার্স ভাইরাসের চেয়ে মারাত্মক নয়'।

ক্ষতিকর লক্ষণ

জ্বর দিয়ে ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়। এরপর শুকনো কাশি দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় এক সপ্তাহ পর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। তখন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দিতে হয়। এখন পর্যন্ত বৈশ্বিকভাবে শনাক্তের তুলনায় মৃত্যুর হার শতকরা ৩ ভাগের কিছু বেশি।

ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলে এখন অধিক মৃত্যুহার দেখা যাচ্ছে। ৫৬ হাজার আক্রান্ত রোগীর উপর চালানো এক জরিপে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে,

* এ রোগে ৬% কঠিনভাবে অসুস্থ হয়। তখন ফুসফুস বিকল, সেপটিক শক, অঙ্গ বৈকল্য এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা তৈরি হয়।

* ১৪% এর মধ্যে তীব্র উপসর্গ দেখা দেয়। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা তৈরি হয়।

* ৮০% এর মধ্যে হালকা উপসর্গ দেখা দেয়। জ্বর কাশি ছাড়াও কারো কারো নিউমোনিয়ার উপসর্গ দেখা যেতে পারে।

বয়স্ক ব্যক্তি এবং যাদের অ্যাজমা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তাদের মারাত্মক অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চীন থেকে পাওয়া তথ্য গবেষণায় জানা

যায়, এ রোগে নারীদের চেয়ে পুরুষদের মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি।

আক্রান্ত ব্যক্তি যেন শ্বাস-প্রশ্বাসে সহায়তা পায় এবং তার দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেন ভাইরাস মোকাবেলা করতে পারে তা নিশ্চিত করাই চিকিৎসকের দায়িত্ব। একটি ভ্যাকসিনের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে উৎপাদন পর্যায়ে রয়েছে। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত একটি ভ্যাকসিনও পরীক্ষার চূড়ান্ত ধাপে রয়েছে। এ টিকার উপাদান হল, কোভিড-১৯ ভাইরাসের একটি জেনেটিক কোড। যা আসল ভাইরাস থেকেই নকল করে তৈরি করা হয়। এ কপিটি বিপজ্জনক নয় এবং তা মানবদেহে সংক্রমণ ঘটাতে পারে না। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতিরক্ষামূলক পোশাক ও সার্জিক্যাল মাস্ক বা মুখোশ পরে রোগীদের আলাদা আলাদা করে চিকিৎসা সেবা দিতে হবে। এ অবস্থায় রোগীদের ভাইরাস রয়েছে কিনা তা জানতে এবং রোগীদের সংস্পর্শে আসা লোকদের শনাক্তের জন্য গোয়েন্দা কর্মকা- বা নজরদারি ব্যবস্থা প্রয়োজন।

ভাইরাসের পরিবর্তন

ভাইরাসটি কোন একটা প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ঢুকেছে এবং একজন থেকে অন্যজনের দেহে ছড়াতে ছড়াতে পুনরায় নিজের জিনগত গঠনে সবসময় পরিবর্তন আনছে। যাকে মিউটেশন বলা হয়। এখন পর্যন্ত এ ভাইরাস বহু বার নিজের জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। অনেকের আশঙ্কা এ মিউটেশনের মাধ্যমে ভাইরাসটি দিন দিন আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এ ভাইরাসের প্রকৃতি এবং কীভাবে তা রোধ করা যেতে পারে এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিশদভাবে জানার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। সার্স বা ইবোলার নানা ধরনের প্রাণঘাতী ভাইরাসের খবর সংবাদ মাধ্যমে আসে। এ করোনা ভাইরাস তার মধ্যে সর্বশেষ।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভাইরাসটি মানুষের দেহকোষে ইতোমধ্যে 'মিউটেট' করছে। অর্থাৎ গঠন পরিবর্তন করে নতুন রূপ নিচ্ছে এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। ফলে এটি আরো বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এ ভাইরাস মানুষের ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায় এবং শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে এটি একজনের দেহ থেকে অন্য জনের দেহে ছড়ায়। সাধারণ ফ্লু বা ঠাণ্ডা লাগার মত করেই হাঁচি-কাশির মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়ায়।

শরীরের ক্ষতিকর দিক

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে করোনাভাইরাস সম্পর্কে প্রথম জানা গেলেও ইতোমধ্যে এ ভাইরাস এবং এর ফলে সৃষ্ট রোগ 'কোভিড-১৯' এর মহামারি সামাল দিতে হচ্ছে বিশ্ববাসীকে। অধিকাংশ মানুষের জন্য এ রোগটি খুব ভয়াবহ নয়, কিন্তু অনেকেই মারা যায় এ রোগে। ভাইরাসটি কীভাবে দেহে আক্রান্ত করে, কেন করে, কেনই বা মানুষ এই রোগে মারা যায়? ভাইরাসটি নিজেকে মানব দেহে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করে। ভাইরাসটি শরীরের কোষগুলোর ভেতরে প্রবেশ করে সেগুলো নিয়ন্ত্রণে নেয়ার মাধ্যমে কাজ শুরু করে। করোনা ভাইরাস-এর আনুষ্ঠানিক নাম সার্স সিওভি-২। যা আক্রান্ত মানুষের হাঁচি বা কাশি ও নিশ্বাসের সাথে সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। অথবা ভাইরাস সংক্রমিত কোনো জায়গায় হাত দেয়ার পর মুখে হাত দিলে শুরুতে তা গলা, শ্বাসনালী ও ফুসফুসের কোষে আঘাত করে। এরপর সে সব জায়গায় কারোনার কারখানা তৈরি করে। প্রাথমিক পর্যায়ে অসুস্থবোধ হয় না এবং কিছু মানুষের মধ্যে হয়তো উপসর্গও দেখা দেবে না। ইনকিউবেশনের প্রথম সংক্রমণ এবং উপসর্গ দেখা দেয়ার মধ্যবর্তী সময় স্থায়িত্ব একেক জনের জন্য একেক রকম হয়, যা গড়ে তা পাঁচ দিন।

অধিকাংশ মানুষের অভিজ্ঞতায় করোনা ভাইরাস নিরীহ অসুখই মনে হবে। দশ জনের মধ্যে আট জন মানুষের জন্যই কোভিড-১৯ নিরীহ সংক্রমণ এবং এর প্রধান উপসর্গ কাশি ও জ্বর। এ ছাড়া শরীর ব্যথা, গলা ব্যথা এবং মাথা ব্যথাও হতে পারে। কারো কারো তা নাও হতে পারে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাইরাসটিকে শত্রুভাবাপন্ন হওয়ায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার ফলে গায়ে জ্বর আসে। প্রাথমিকভাবে করোনা ভাইরাসের কারণে শুষ্ক কাশি হয়। কোষগুলো ভাইরাসের মাধ্যমে সংক্রমিত হওয়ায় অস্বস্তিতে পড়ার কারণে সম্ভবত শুকনো কাশি হয়ে থাকে। তবে অনেকের কাশির সাথে থুতু বা কফ বের হওয়া শুরু করবে। যার মধ্যে ভাইরাসের প্রভাবে মৃত ফুসফুসের কোষগুলোও থাকবে। এ ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে পরিপূর্ণ বিশ্রাম, প্রচুর তরল পান করা এবং প্যারাসিটামল খাওয়ার উপদেশ দেয়া হয়ে থাকে। তখন হাসপাতাল বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন হয় না। এ ধাপটি এক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। অধিকাংশ মানুষ এ ধাপের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। কারণ ততদিনে তাদের

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাইরাসের সাথে লড়াই করে সেটিকে প্রতিহত করে ফেলে। তবে কিছু মানুষের মধ্যে কোভিড-১৯ এর আরো ক্ষতিকর একটি সংস্করণ তৈরি হয়। এ রোগ সম্পর্কে নতুন গবেষণায় ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে, রোগটির এ ধাপে আক্রান্তদের সর্দিও লাগতে পারে।

ভয়াবহতা

লণ্ডনের কিংস্ কলেজের ড. নাথালি ম্যাকডরমেট বলেন, ‘ভাইরাসটি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। ফলে শরীর অতিরিক্ত মাত্রায় ফুলে যায়। কীভাবে এটি ঘটছে, তা আমরা এখনো নিশ্চিতভাবে জানি না’। ফুসফুসের প্রদাহ তৈরি হওয়াকে নিউমোনিয়া বলে। মুখ দিয়ে প্রবেশ করে শ্বাসনালী দিয়ে ফুসফুসের ছোট টিউবগুলোয় যদি যাওয়া যেত, তাহলে হয়ত শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের বায়ুথলিতে গিয়ে পৌঁছত। এ থলিগুলোর মাধ্যমে রক্তে অক্সিজেন যায় এবং কার্বনডাই অক্সাইড বের হয়। কিন্তু নিউমোনিয়া ক্ষেত্রে এ ক্ষুদ্র থলিগুলো পানি দিয়ে ভর্তি হতে শুরু করে। ফলে শ্বাস নিতে অস্বস্তিবোধ হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যার মত উপসর্গ তৈরি করে। কিছু মানুষের শ্বাস নিতে ভেন্টিলেটর প্রয়োজন হয়। চীন থেকে পাওয়া তথ্য উপাত্ত অনুযায়ী এ ধাপে ১৪% মানুষ আক্রান্ত হয়।

এখন পর্যন্ত ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ৬% করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ অতি জটিল পর্যায়ে রয়েছে। এ ধাপে শরীর স্বাভাবিক কার্যক্রম চালাতে সক্ষম হয় না এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা তৈরি হয়। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সারা শরীরে বিভিন্ন রকম ক্ষয়ক্ষতি তৈরি করে। রক্তচাপ যখন অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় তখন এ ধাপে আক্রান্ত ব্যক্তি সেপটিক শক পেতে পারেন। তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফুসফুসে প্রদাহ ছড়িয়ে পড়লে শ্বাস-প্রশ্বাসে তীব্র সমস্যার উপসর্গ দেখা দেয়। কারণ তখন শরীরকে টিকিয়ে রাখাতে পুরো শরীরে পর্যাপ্ত অক্সিজেন প্রবাহিত হতে পারে না। ফলে কিডনির রক্ত পরিশোধন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে এবং অন্ত্রের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ডা. বি. পঞ্চানিয়া বলেন, ‘ভাইরাসটি এত বড় পরিসরে প্রদাহ তৈরি করে, যাতে পুরো শরীর ভেঙ্গে পড়ে, একসাথে একাধিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ করে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যদি ভাইরাসের সাথে পেরে না ওঠে তখন তা শরীরের সব প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং আরো বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি করে। এ অবস্থায় আক্রান্তকে চিকিৎসা দিতে ইসিএমও বা এক্সট্রা-কোর্পোরেয়াল মেমব্রেন অক্সিজেনেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হতে পারে’।

প্রথম মৃত্যু

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও কোন কোন সময় রোগীর মৃত্যু ঘটে। চীনের উহান শহরের জিনইনতান হাসপাতালে মারা যাওয়া দুজনই স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ছিলেন, যদিও তারা ধূমপান করতেন। প্রথমে ৬১ বছর বয়সের পুরুষটি মারা যায়। হাসপাতালে ভর্তির সময় তার তীব্র নিউমোনিয়া ছিল। তার শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা ছিল। তাকে ভেন্টিলেটরে রাখা হলেও তার ফুসফুস বিকল হয়ে যায় এবং হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতালে ১১ দিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। দ্বিতীয় রোগীর বষয় ৬৯ বছর। তারও শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাপক সমস্যা ছিল। তাকেও ইসিএমও মেশিনের সহায়তা দেয়া হয়, তবুও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। রক্তচাপ কমে যাওয়ার পর তিনি তীব্র নিউমোনিয়া ও সেপটিক শকে মারা যান।

সংক্রমণ প্রশমনে করণীয়

*** গণপরিবহন:** গণপরিবহন এড়িয়ে চলা কিংবা সর্তকতার বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাস, ট্রেন, স্টিমার ও অন্য যে কোন পরিবহনের হাতল বা আসনে করোনা ভাইরাস থাকতে পারে। সেজন্য পরিবহনে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করা এবং সেখান থেকে নেমে ভালোভাবে হাত পরিস্কারে গুরুত্ব দিচ্ছেন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা।

*** কর্মক্ষেত্র :** অফিসে এক ব্যক্তি একই ডেস্ক এবং কম্পিউটার ব্যবহার করলেও ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাঁচি কাশি থেকে করোনা ভাইরাস ছড়ায়। যে কোন জায়গায় করোনা ভাইরাস কয়েক ঘন্টা এমনকি কয়েকদিন পর্যন্ত থাকতে পারে। অফিসের ডেস্কে বসার আগে কম্পিউটার, কীবোর্ড এবং মাউস পরিস্কার করে নিতে হবে।

*** জনসমাগম স্থল :** যে সব জায়গায় মানুষ বেশি জড়ো হয় সে সব স্থান এড়িয়ে চলা কিংবা বাড়তি সর্তকতার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে খেলাধুলার স্থান, সিনেমা হল, ইত্যাদি রয়েছে।

* **ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান :** ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকদের অনেকে একটি কলমই ব্যবহার করেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি সে কলম ব্যবহার করে, তাতে পরবর্তী ব্যবহারকারীদের করোনা সংক্রমনের ঝুঁকি থাকে। সে জন্য নিজের কলম নিজেকে ব্যবহার করতে হবে। টাকা উত্তোলনে এটিএম বুথ থেকেও সংক্রমণ হতে পারে। কারণ এর বাটন ব্যবহারকারীদের মধ্যে করোনা আক্রান্ত থাকতে পারে।

* **লিফ্ট :** বাড়ি ও অফিসের লিফ্ট থেকেও ভাইরাস সংক্রমণ হতে পারে। লিফ্টে উঠা-নামার সময় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কেউ লিফ্টের বাটন ব্যবহার করলে তাতে অন্যদেরও সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। তাই লিফ্ট থেকে নেমে হাত পরিষ্কার করে নিতে হবে।

* **টাকা-পয়সা :** ব্যাংক নোট বা টাকা-পয়সায় নানা ধরনের জীবাণুর উপস্থিতি বহুবার শনাক্ত হয়েছে। ব্যাংক নোটের মাধ্যমেও নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশের কিছু গবেষক ২০১৯ সালের অগাস্ট মাসে বলেছিলেন, দেশীয় কাগুজে নোট ও ধাতব মুদ্রায় ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পেয়েছেন, যা সাধারণত মলমূত্রে থাকে। সম্প্রতি ভাইরাসের উপস্থিতি নিয়ে চীনে টাকা জীবাণুমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশটিতে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর পর ভাইরাসটির বিস্তার ঠেকাতে বাজার থেকে ব্যাংক নোট সংগ্রহ করে তা জীবাণুমুক্ত করে সরবরাহ করা হয়েছে।

* **শুভেচ্ছা বিনিময় :** করমর্ধন ও কোলাকুলির মাধ্যমেও করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে। তাই করমর্দন এবং কোলাকুলি না করার পরামর্শ দিচ্ছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। সবকিছুর মূল হচ্ছে নিজে এবং পরিবেশকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা। হাত ধুয়েই মুখম-ল স্পর্শ করা। এটি করা হলে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে না। সংক্রমণ ঠেকাতে নিয়মিত ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করছেন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা।

* **স্থায়িত্ব :** করোনা ভাইরাস বিভিন্ন জিনিসে থাকার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, সাধারণ জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা হলে এগুলো খুব সহজে নষ্ট হয়ে যায়। গবেষণায় জানা গেছে, এ ভাইরাস স্টীল বা প্লাস্টিকের ওপরে ৭২ ঘন্টা, পিতলের ওপর ৪ ঘন্টা এবং কার্ডবোর্ডের ওপর ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয়

শিশুরা মানসিক চাপের মুখে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। যেমন মায়ের গায়ের সাথে বেশি লেপ্টে থাকা, কথা না বলা, বিনাকারণে রেগে যাওয়া বা উত্তেজিত হওয়া, বিছানা ভিঝিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। সন্তানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সহানুভূতি দেখাতে হবে। তারা কী বলতে চায় শুনতে হবে এবং তাদের বেশি আদর করতে হবে। কঠিন সময়ে শিশুদের প্রতি ভালোবাসা, মনোযোগ ও সময় দিতে হবে। তাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলতে হবে এবং তাদের দাবি বা আবদার পূরণে আশ্বস্ত করতে হবে।

শিশুদের খেলার, ছবি আঁকার এবং আরাম করার সুযোগ দিতে হবে। তাদেরকে মা বাবা ও পরিবারের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করতে হবে। যতটা সম্ভব তাদের দেখাশুনার লোক থেকে আলাদা করা যাবে না। প্রতিদিন স্কুল বা মাদ্রাসায় যাওয়া, লেখাপড়া শিখা, খেলাধুলা করা ও আরাম আয়েশ ইত্যাদিতে রুটিন অনুসরণ করাতে হবে। প্রতিদিন যা ঘটে থাকে এর ভালো কিছু তাদের জানাতে হবে।

গর্ভবতীর করণীয়

কোভিড-১৯ সংক্রমণ সনাক্ত হোক বা না হোক, গর্ভবতী নারী এবং নবজাতক ও ছোট শিশুর মায়েদেরকে বুকের দুধ খাওয়ানো বিষয়ক পরামর্শ, সেবা, মৌলিক মনোসামাজিক সহায়তা এবং বুকের দুধ খাওয়ানো বিষয়ক ব্যবহারিক সহায়তা দিতে হবে। গর্ভবর্তী মায়ের করোনা ভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে শিশুর জন্ম পরবর্তী সময়ে হাসপাতালে না যাওয়াই ভাল, যতক্ষণ আইসোলেশন কাল শেষ না হয়। যদি গর্ভবতী মায়ের এপয়েন্টমেন্ট বাতিল হয়ে যায় তবে প্রসূতি ইউনিটের সাথে কথা বলে পুনরায় এপয়েন্টমেন্ট নিশ্চিত করে নিতে হবে। বাচ্চার করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সন্দেহ থাকলে তাকে সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

করোনা ভাইরাস হল বৈশ্বিক মহামারী ও মহাদুর্যোগ। এতে বিশ্বের বহু মানুষ মারা যায়। এখনো প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে। চিকিৎসাসেবায় সুস্থও হচ্ছে। তবে সুস্থের তুলনায় মৃতের সংখ্যা অধিক। প্রাণঘাতি এ রোগের কারণে ইতোমধ্যে বিশ্ব অর্থনীতি বড় ধরনের মন্দা ও সংকটে পতিত হতে শুরু করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ

থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্জন ও জ্ঞান চর্চায় চরম ব্যাঘাত হয়েছে এবং হচ্ছেও।

করোনা ভাইরাসের প্রথম ধাক্কা শেষ না হতেই বর্তমানে এর দ্বিতীয় ঢেউ চরমভাবে আঘাত হানতে শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেকে- ওয়েব শুরু হওয়ায় নতুন করে লক-ডাউন, শার্ট-ডাউনসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মকা- নানামুখী সর্তকতা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। শীতপ্রধান দেশগুলোতে কারোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সংক্রমণ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশেও দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। জুলাই মাসে চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ সংক্রমণের পর অক্টোবরে অনেকটা শূন্যের কোটায় নেমে আস্‌লেও নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তা বাড়তে থাকে। নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ শনাক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্বেগের সাথে লক্ষ্যণীয়, সংক্রমণ বাড়লেও মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি। গণপরিবহণ ও জনসমাগমে মাস্ক না পরে অবাধে চলাফেরা করছে মানুষ। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও সিটি কর্পোরেশন মাস্ক ব্যবহারে সচেতনতা কর্মসূচির পাশাপাশি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতেও দেখা যায়। মাস্কবিহীন ব্যক্তিদের জেল-জরিমানাও করা হচ্ছে। ফলে চলাচলের মানুষ কিছুটা সচেতন হলেও বাজারে ও গণপরিবহণে শারীরিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না। এটি নিয়ন্ত্রণে আনা না গেলে করোনার প্রকোপ কমানো সম্ভব হবে না।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ভ্যাকসিন গবেষণা উদ্ভাবন, উৎপাদন, পরীক্ষণ ও বিক্রয়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। তবে ভ্যাকসিন প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ার বাস্তবতাও অস্বীকার করা যায় না। সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সফল ভ্যাকসিনের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এর মোকাবেলায় সকলের মাস্ক পরা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে সতকর্তা বাড়াতে হবে।

করোনার দ্বিতীয় ধাপে সংক্রমণ মারাত্মক ও ব্যাপক প্রাণঘাতি হয়ে ওঠার আগেই তা প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ দিতে হবে। জনসমাগম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আইনী ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। করোনা হটলাইন ও ভার্চুয়াল স্বাস্থ্যসেবা বাড়াতে হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অধিদফ্তর ও সংস্থাগুলোকে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে হবে।

প্রবন্ধটি ১০ ডিসেম্বর ২০২০ বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা রাঙ্গুনিয়া উপজেলা শাখা আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়।

তথ্য সূত্র :

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বুলেটিন ২০২০
২. নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সুরক্ষা বিষয়ক ইশতেহার :বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা রাঙ্গুনিয়া উপজেলা মডেল শাখা, চট্টগ্রাম। ২৫ মার্চ ২০২০
৩. সম্পাদকীয় : দৈনিক পূর্বদেশ, চট্টগ্রাম। ২৫ নভেম্বর ২০২০
৪. সম্পাদকীয় : দৈনিক পূর্বকোণ, চট্টগ্রাম। ২৮ নভেম্বর ২০২

লেখক - বিশিষ্ট চিকিৎসক

সরকারি খাস জায়গায় মসজিদ : শর‘ঈ ফয়সালা

মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

মসজিদ আল্লাহর ঘর, মুসলমানদের পবিত্র স্থান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, وان المساجد لله الاية.. ‘মসজিদগুলো মহান আল্লাহরই জন্য।’

[সূরা জ্বিন, আয়াত-১৮]

মসজিদ নির্মাণ করা, মসজিদের আদব রক্ষা করা, মসজিদের যথার্থ সংরক্ষণে ইসলামী নির্দেশনা ও মুজতাহিদ ফক্বীহগণের নীতিমালা অনুসরণ করা সকল মুসলমানের উপর অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

তরজমা: নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা তাওবা, আয়াত-১৮]

মসজিদ আল্লাহর জন্য ওয়াক্বফকৃত হওয়া শর্ত

ইসলামী শরীয়তে মসজিদ হলো মুসলমানদের ইবাদতের সুনির্দিষ্ট স্থান। যেটি আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য ওয়াক্বফকৃত সেখানে বান্দার কোন মালিকানা ও অধিকার থাকতে পারবে না।

[ফতোওয়ায়ে ফয়জুর রসূল, খন্ড-২, পৃ. ৬৫০, কৃত. মুফতি জালাল উদ্দিন আমজাদী]

এতে আরো উল্লেখ রয়েছে, মসজিদ হওয়ার জন্য ওয়াক্বফ করা অপরিহার্য। ওয়াক্বফ’র ক্ষেত্রে লিখিত রেজিস্ট্রীকৃত হওয়া শর্ত নয়, তবে পরবর্তিতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হওয়ার জন্য লিখিত ওয়াক্বফ হওয়া উত্তম। ওয়াক্বফবিহীন মসজিদে নামায পড়লে হয়ে যাবে তবে এটাকে শরয়ী মসজিদ বলা যাবে না। ওয়াক্বফকৃত স্থানে মসজিদ নির্মিত হলে সেখানে নামায আদায় করা হলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে স্থান মসজিদ হিসেবে নির্ধারিত থাকবে। সে স্থান অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

সরকারী জায়গায় সরকারের অনুমতি ব্যতীত মসজিদ বানানো শরীয়ত সম্মত নয়। তবে সরকারের দায়িত্ব হলো জনস্বার্থে একান্ত অপরিহার্য হলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান বজায় রেখে সরকারী ব্যবস্থাপনায় এলাকার মুসল্লিদের সহযোগিতায় সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে নামায প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে সরকারী জায়গায় রাস্তার পার্শ্বে অনুমতি ছাড়া কেউ মসজিদ নির্মাণ করলে সেখানে জনস্বার্থে প্রয়োজনে রাস্তা প্রশস্ত করে পার্শ্ববর্তী সুবিধাজনক স্থানে মসজিদ স্থানান্তর করতে অসুবিধা নেই। এ প্রসঙ্গে হিজরি নবম শতকের প্রখ্যাত ফক্বীহ্ আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম হালভী হানফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর প্রণীত ‘মুনীয়াতুল মুসল্লী’ ফাতওয়া গ্রন্থের ৪৩২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,

رجل بنى مسجد اعلى سور المدينة لاينبغى ان يصلى فيه لانه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبنى فى ارض مغصوبة

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি শহরের যাতায়াত বা চলাচলের পথের উপর মসজিদ নির্মাণ করলে তাতে নামায আদায় করা সমীচিন নয়। কেননা সেটি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট। এটা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য বিবেচিত হবে না। জবরদখলকৃত সরকারি ভূমির উপর নির্মিত স্থাপনার হুকুম একই অর্থাৎ সরকার তা দখল করে জনস্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে। অন্যের সম্পত্তিতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মসজিদ বা অন্য কিছু প্রতিষ্ঠা করা বা ব্যবহার করা জায়েয নেই।

[প্রখ্যাত ফাত্ওয়া গ্রন্থ ‘দুররুল মুখতার’ কৃত. ইমাম আলাউদ্দিন খাচকাপী, হানাফী রহ. ৯ম খন্ড, ২৯১ এ অভিমত উল্লেখ করেছেন।]

সুতরাং সরকারী জায়গায় কেউ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া স্বেচ্ছায় মসজিদ নির্মাণ করলে সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন জনস্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনে সেখানে রাস্তা সম্প্রাসরণ করতে পারবে। তবে পার্শ্ববর্তী নিকটতম স্থানে এলাকার মুসলমানদের ইবাদত ও নামায কায়েমের জন্য মসজিদ নির্মাণ করে দিবে। যাতে এলাকার মুসলমান ও মুসল্লীদের অন্তরে ক্ষোভ ও ফিত্না সৃষ্টি না হয়। উপরোক্ত বিষয়ে এটাই ইসলামী শরীয়তের ফয়সালা।

আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ, প্রধান ফকিহ্, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, আল্লামা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি অধ্যক্ষ মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া (ফাযিল)সহ বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম উপরোক্ত মাসআলায় একমত পোষণ করেছেন।

লেখক: অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

উত্তর দিচ্ছেন: অধ্যক্ষ মুফ্‌তি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

✍ **রাহাতে হালিমা**
ছাত্রী: বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

◈ **প্রশ্ন: করোনা ভাইরাসের কারণে মহল্লায় জামে মসজিদে জুমা ও জমাত বন্ধ করা যাবে কিনা?**

📖 **উত্তর:** করোনা ভাইরাস বা অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হবে, রোগ বেড়ে যাবে, এমন আশংকায় বা ভয়ে সর্বসাধারণের জন্য জুমা-জামাত মসজিদে আদায় বন্ধ করে দেয়া ইসলামী শরীয়তে অনুমোদন নেই। তবে যে ব্যক্তি কোন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মসজিদে জুমা-জামাতে শরীয়ক হতে না পারলে তা ভিন্ন কথা। তাছাড়া মুষলধারে বৃষ্টির দরুন রাস্তায় বেশি কাদা হলে, মসজিদে যাওয়ার রাস্তা অতি অন্ধকার হলে বা এমন জটিল রোগে আক্রান্ত হলে যার কারণে চলতে অক্ষম হয় ও প্রচন্ড ঠান্ডায় ঘর হতে বের হলে রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা হলে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এসব ওজর/অপারগতার কারণে জুমা-জামাতে শরীক বা উপস্থিত হতে না পারলে তার জন্য রুখসত বা অনুমতি আছে।

[রদ্দুল মোহতার ও ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, নামায অধ্যায় ইত্যাদি]

◈ **প্রশ্ন: ভাইরাস ছোয়াছে অন্যরা আক্রান্ত হবে মনে করে মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা না করে মৃত ব্যক্তির লাশ আগুনে জ্বালানো শরিয়তসম্মত কিনা। জানালে উপকৃত হব।**

📖 **উত্তর:** ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে অথবা যে কোনভাবে মৃত্যুবরণকারী মুসলিম নর-নারীকে গোসল, কাফন, দাফন ও নামাযে জানাযার ব্যবস্থা না করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার অভিমত সম্পূর্ণ নাজায়েজ এবং ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থী ও মুসলিম মৃত ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ জুলুম। কেননা জীবিত মুসলিম মানবদেহ যেমন সম্মানিত, তেমনি ইন্তেকালের পরও মুসলমানদের মরদেহ সম্মানিত। তাই মৃত্যুবরণকারী মুসলিম, নর-নারীকে ইন্তেকালের পর নেহায়ত আদব ও সতর্কতার সাথে গোসল, কাফন, নামাজে জানাযার ব্যবস্থা ও মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা ইসলামের বিধান ও অলি-ওয়ারিসের উপর মায়্যেতের হক।

এ প্রসঙ্গে হযরত উম্মুল মুমেনীন আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

অর্থাৎ মৃতের শরীরের হাড্ডি ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির শরীরের হাড্ডি ভাঙ্গার মত অপরাধ।

[আবু দাঊদ শরীফ, হাদীস নং-৩২০৭]

যেখানে মৃত ব্যক্তির একটি হাড্ডি ভাঙ্গাই নিষেধ, সেখানে পুড়িয়ে ফেলা আরো জঘন্যতম অপরাধ। তাই ভাইরাস বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী মুসলিম নর-নারীকে গোসল, কাফন, নামাজে জানাযা ও মুসলিম কবরস্থানে দাফনের ব্যবস্থা না করে আগুনে জ্বালানো/পুড়িয়ে ফেলার অভিমত ব্যক্ত করা মূলতঃ মুসলিম মায়্যেতের ওপর অবিচার করা ও ইসলামী শরীয়তের বিধানের প্রতি হেয় প্রদর্শন করার নামান্তর। যেভাবে মহামারী ভাইরাসে আক্রান্তদের সতর্কতার সাথে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা জরুরী তদ্রুপ ভাইরাস বা অন্য যে কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে কোন মুসলিম নর-নারী মৃত্যুবরণ করলে তাকে ইসলামী শরীয়তের নিয়ম বা বিধান মোতাবেক সতর্কতার সাথে গোসল, কাফন, জানাযার নামাজ ও দাফনের ব্যবস্থা করা অলি ওয়ারিশ ও আত্মীয়স্বজনের উপর পরম দায়িত্ব-কর্তব্য। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের ২য় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযমের সময়ে এবং তাঁর পরবর্তী যুগে একাধিকবার বসরা, কুফা ও সিরিয়াসহ বিশ্বের বহু দেশে/শহরে, প্লেগ, বসন্ত ও মহামারী হয়েছিল এবং এতে কোন কোন সাহাবী, তাবেয়ীসহ হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছেন কিন্তু কোন সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তবে-তাবেয়ীনের কেউ ছোঁয়াছে বা রোগ ছড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে মুসলিম মৃতগণকে আগুনে জ্বালাননি বরং ইসলামী শরীয়তের

বিধানানুযায়ী গোসল, কাফন, নামাযে জানাযার এবং দাফনের ব্যবস্থা করেছেন। এটাই ইসলামী শরীয়তের ফায়সালা। এ বিষয়ে আমরা অনলাইনে/ফেইসবুকে বিস্তারিত মাসআলা বর্ণনা করে মুসলিম মিল্লাতকে সজাগ করেছি।

[শরহে মুকাদ্দামায়ে ইমাম মুসলিম, কৃত. ইমাম নববী রহ. ১৫,১৬, ১৭পৃ. ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ আরফাতুল ইসলাম**
ছাত্র: বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসা,
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: ভাইরাসের কারণে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাতে ৫ জন এবং জুমার নামাযে ১০ জন মুসল্লি নির্দিষ্ট করে দেওয়া কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর: জুমার নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য সপ্তম শর্ত হলো اذن عام অর্থাৎ জুমার নামায আদায়ে সকলের জন্যে উন্মুক্ত অনুমতি থাকতে হবে। মুসল্লিগণ যেন বাঁধার সম্মুখীন না হয়। আর বিশেষ প্রয়োজন তথা করোনা ভাইরাস বা বড় কোন দুর্যোগের সময় বিপর্যয় হতে রক্ষার তাগিদে হাট-বাজারে ও লোকালয়ে লোক সমাগম সীমিত রাখা যায়। তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু মুসল্লী সংখ্যা জুমা জমাতে নির্দিষ্ট করে দেয়া ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণে সমর্থিত নয়। তবে করোনা বা মহামারি অথবা বাঘের ভয়ে কেউ জুমা-জামাতে না আসলে ভিন্ন কথা। যদি মসজিদে জুমা আদায় করার জন্য মুসল্লীগণ সমবেত হয়ে গেল, এমতাবস্থায় মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেয়া বা প্রবেশে বাঁধা প্রদান করে জামাআত আদায় করা শরিয়ত সমর্থিত নয়। অবশ্য ৫ জন ও ১০ জনের সীমা রেখা বর্তমানে রহিত হয়ে গেছে। উপরোক্ত বিষয়ে যথাসময়ে আমরা অনলাইনে/পেইসবুকের মাধ্যমে সঠিক মাসআলা মুসলিম মিল্লাতকে বিস্তারিত অবগত করেছি।

[আলমগীরী ও মু'মিন কি নামায জুমার মাসআলা ইত্যাদি]

প্রশ্ন: মাস্ক মুখে লাগিয়ে নামাজ আদায় করলে নামায আদায় হবে কিনা? জানালে ধন্য হব।

উত্তর: বর্তমান মহামারী পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসের ভয়ে সতর্কতা স্বরূপ স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে হালকা/পাতলা মুখে মাস্ক পরে নামাজ আদায় করলে দুর্যোগময় বিশেষ পরিস্থিতির দরুন নামায আদায় হয়ে যাবে তবে সূরা, কেরাত, ছহি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হবে। তবে কোন বিশেষ ওজর ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় মাস্ক বা অন্য কিছু দিয়ে নামাজ আদায়কালীন নাক মুখ তথা মুখমন্ডল ঢেকে রাখতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদীসে পাকে নিষেধ করেছেন।

[সুনানে ইবনে মাজাহ্, হাদিস নং-৯৬৬]

অপর হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাজের সময় কাপড় ওপর থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে ও মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন।

[সুনানে আবু দাউদ শরীফ, ৬৪৩ নং হাদিস]

তাছাড়া ফিক্বহের বিভিন্ন কিতাবে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন নুরুল ঈযাহ্ গ্রন্থে রয়েছে-

يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّىْ تَغْطِيْةُ اَنْفِه وَفَمِه وَضْعُ شَيْءٍ فِىْ
فَمِه يَمْنَعُ الْقِرَأَةَ الْمَسْنُوْنَةُ [كتاب الصلواة]

অর্থাৎ নামাযী ও মুসল্লিদের জন্য নামায অবস্থায় নাক ও মুখ ঢেখে রাখা এবং মুখের মধ্যে এমন কিছু রাখা মাকরূহ যা সুন্নত মোতাবেক কেরাত পড়তে বাঁধা সৃষ্টি করে। [নামায অধ্যায়, মাকরূহ অনুচ্ছেদ]

তাই বিশেষ প্রয়োজন ও ওজর ব্যতীত নামাযাবস্থায় নাক, মুখ ঢেকে রাখা অর্থাৎ কাপড় দ্বারা হোক বা মাস্ক দ্বারা হোক, এমনভাবে ঢেকে রাখা যাতে চেহেরা বা নাক দেখা না যায় তা মাকরূহে তাহরীমী।

[দুররে মুখতার, আলমগীরী, বাহারে শরীয়ত, ৩য় খন্ড, ১৬৭পৃ.
ও মুমিন কি নামায, ১০ম অধ্যায় ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন কাদেরী**
কামিল ২য় বর্ষ, শাহাচন্দ আউলিয়া আলিয়া মাদরাসা
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: বিভিন্ন স্থানে যে খতমে গাউসিয়া শরীফ আয়োজন করে থাকে। এর ফযীলত সম্পর্কে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: কাদেরিয়া তরিকার আউলিয়ায়ে কেরাম কর্তৃক নির্বাচিত এবং কুরআনুল করিম ও হাদীস শরীফ থেকে সংগৃহীত, বরকতমন্ডিত ও ফজিলতপূর্ণ যিকির-আযকার, দোয়া-দরুদ, বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের সমষ্টিগত নাম হল খতমে গাউসিয়া শরীফ। উল্লেখ্য যে, খতমে গাউসিয়া শরীফের তরতীবে যে অজিফাগুলো স্থান পেয়েছে তা বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলতে পরিপূর্ণ। যা ভক্তি সহকারে পালনের মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক কল্যাণ ও সফলতা। এটা শরীয়তসম্মত। এটাকে অস্বীকার করা কুরআন-হাদীস তথা শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার নামান্তর এবং সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওলীদের

প্রদর্শিত মত ও পথকে অবজ্ঞা করা। খতমে গাউসিয়া ও গেয়ারভী শরীফ এবং এ জাতীয় বরকতমন্ডিত খতমসমূহ যেমন খতমে খাজেগান ইত্যাদি মূলত আমলে সালেহ বা সৎ কর্ম। কেননা এতে রয়েছে- আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের স্মরণ, জিকির-আযকার, দোয়া-দরুদ, ফাতেহাখানি এবং আল্লাহর বান্দাদের মাঝে তবরুক পরিবেশন। এসবই আমলে সালেহ বা নেক আমল। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ □

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল আমলসমূহ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত তথা বাগিছাসমূহ যার তলদেশে অনেক নহর বা ঝর্ণা ধারা। এটা তাদের জন্য বড়ই সফলতা।

[সূরা বুরুজ, আয়াত নং-১১]

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى
وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه □ حَيٰوةً طَيِّبَةً-

অর্থাৎ ঈমান থাকাবস্থায় পুরুষ বা মহিলা হতে যে ভাল কাজ করবে তাকে আমি পবিত্র জীবন দান করব। [সূরা নাহল, আয়াত-৯৭]

তাই খতমে গাউসিয়া, খতমে খাজেগান ও খতমে গেয়ারভী শরীফ ইত্যাদি মূলতঃ কুরআন-হাদীসের বাস্তব আমল। তাছাড়া এ সমস্ত খতমসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও আলিয়ায়ে কেরামকে স্মরণ করা হয় যা কুরআন-হাদীসের আলোকে যিকরুল্লাহর সামিল। কেননা, আল্লাহর যিকর কয়েক প্রকারঃ ১. সরাসরি আল্লাহর জাত ও তাঁর গুণাবলীকে স্মরণ করা, ২. আল্লাহর নবী-রাসূল এবং তাঁর প্রিয় বান্দাগণের ও তাঁর প্রিয় বরকতমন্ডিত বস্তুসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা, ৩. আল্লাহর দুশমনদের তিরস্কার ও নিন্দাপূর্বক আলোচনা। কাজেই বুঝা গেল, খতমে গাউসিয়া, খতমে খাজেগান, দরুদে তাজ, সাজরা শরীফ ও সালাত-সালাম শুরু হতে শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহর যিকির ও আল্লাহর অলিদের জিকির/স্মরণ-ভক্তি ও আদব-মুহাব্বত সহকারে এগুলো আদায় করা মানে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। বিশেষত যেসব মুসলমান এসব খতমে শরীক হয়, তাদের অনেকে কুরআন তেলাওয়াত, আসমাউল হুসনা, বরকতময় জিকির-আযকার জানে না। ফলে এসব খতমে তারা সবার সাথে মুখে মুখে উচ্চারণ করে পাঠ করার মাধ্যমে অশেষ ফযিলত হাসিল করে।

সুতরাং এ সমস্ত খতমসমূহ ও দুআ দরুদ ঘরে-বাসায়, দোকানে-অফিসে ভক্তি ও আদবের সাথে আদায় করা অত্যন্ত ফজিলত ও বরকতময়।

[শাজরা শরীফ, সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া,
যুগ জিজ্ঞাসা, প্রকাশনায় আনজুমান ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।]

খতমে গাউসিয়া শরীফের ইসিমসমূহের মধ্যে সূরা ইখলাস অন্যতম। সূরা ইখলাসের ফজিলত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন, তোমাদের কারও জন্য এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করা কি কঠিন কাজ? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমাদের কার এমন শক্তি আছে যে, এরূপ পারবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, قل هو الله احد تعدل ثلث القران অর্থাৎ 'কুল হুয়া আল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। [সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং-৪৬৪৫]

অপর এক হাদীসে সূরা ইখলাস সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰن

[رواه البخارى]

অর্থাৎ আল্লাহর শপথ বা কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, এ সূরা (কুল হুয়া আল্লাহু আহাদ) হলো (সওয়াব ও নেকীর দিক দিয়ে) সমগ্র কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

[সহীহ্ বুখারী শরীফ, ৪৬৪৪নং হাদীস, ফাজায়েলে কুরআন অধ্যায়]

'জামে সগীর' হাদীসের গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ قَرأَ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) عَشَرَ مَرات بَنِى
اللّٰه ُلَه بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দশ বার সূলা ইখলাস পড়বে, আল্লাহ্ তাঁর জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন।

[জামে সগীর, হাদিস নং-৬৪৭২]

এভাবে আরো বহু হাদীস শরীফ রয়েছে সূরা ইখলাসের ফজিলত সম্পর্কে। আর খতমে গাউসিয়া

শরীফে সূরা ইখলাস পাঠ করা হয় (১১১১) এক হাজার একশত একবার।

হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে তিনবার পাঠ করলে এক খতম কুরআন পাঠের সাওয়াব অর্জন করার সুযোগ হয় সেখানে **১১১১** বার তেলাওয়াত করলে কত খতমের সাওয়াব মিলবে তা হিসেব করলেই বুঝা যাবে। এছাড়া এমন একটি তাসবীহ্ উক্ত খতমে রয়েছে,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَلِىِّ
الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ الله

এ তাসবীহ্ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى
اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللهِ
وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

অর্থাৎ এমন দু'টি বাক্য আছে যা দয়াময় আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। মুখে উচ্চারণ করতে অধিক সহজ, (সওয়াবের ক্ষেত্রে) দাড়ি পাল্লায় পরিমাপে বেশী ভারী। বাক্য দু'টি হলো 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আজীম।

[সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-৭০৫১]

এভাবে খতমে গাউসিয়া শরীফে **১১১** বার করে দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়, যা একবার পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা ১০টি নেকী দান করেন, ১০টি গুনাহ্ মাফ করেন এবং ১০টি দরজাত বুলন্দ করেন।

খতমে গাউসিয়া শরীফ সাজরা শরীফসহ প্রতিটি ইসিম ও প্রত্যেকটি আমলের সওয়াব অনেক বেশী এবং ফজিলতমন্ডিত। তাই খতমে গাউসিয়া শরীফ, কছিদায়ে গাউসিয়া, সাজরা শরীফ ও সালাত-সালাম নেহায়ত ভক্তি ও মহব্বতের সাথে আদায় করার অনুরোধ রইলো। যত বেশি মহব্বত ও আদব ভক্তির সাথে আদায় করা হয় ততবেশি উপকৃত ও লাভবান হওয়া যায়।

✍ **মুহাম্মদ ইরফান**
রোটারী বেতাগী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ চল্লিশ দিনের দিন উক্ত মরহুমের নিজ পাড়ার গরিব-মিসকিনকে মরহুমের ব্যবহৃত সকল জিনিসপত্র দেওয়া হয়। এ নিয়মটি ইসলামে জায়েয আছে কিনা? জানালে ধন্য হবো।

উত্তরঃ একজন মুসলমানের ইন্তেকালের পর তার পরিত্যক্ত রেখে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পদের মালিক বা উত্তরাধিকার হয় ওয়ারিশগণ। এ কারণে ইন্তেকালের পর মৃত ব্যক্তির কাফন, দাফন ও অছিয়ত থাকলে পূরণ করা ও কর্জ থাকলে পরিশোধ করা ওয়ারিশগণের ওপর ওয়াজিব বা অপরিহার্য। আর কর্জ/ঋণ পরিশোধ এবং অছিয়ত পূরণের পর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ (টাকা-পয়সা, জমি-জমা, স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, ব্যবহৃত জিনিসপত্র) হতে গরিব-মিসকিন ও অসহায়দের মাঝে দান করা জায়েয বা বৈধ এবং অত্যন্ত সওয়াবজনক। তদুপরি মৃত স্বীয় মা-বাবা বা হকদার আত্মীয় স্বজনের কবরে/রূহে ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ছেলে-সন্তান ও ভাই বেরাদর স্বীয় সম্পদ হতে সাদকা-খায়রাত করা। চাহরম, (চারদিন্না) চেহলাম (চল্লিশা) বা মাসিক/বার্ষিক-ফাতেহা, জিয়াফতের আয়োজন করা, মিলাদ মাহফিল ও দোয়া মুনাজাতের ব্যবস্থা করা জায়েয এবং বরকতময়। তাই উক্ত উদ্দেশ্যে মরহুম/মরহুমার চল্লিশ দিন/চেহলাম উপলক্ষে ব্যবহৃত জামা কাপড়সহ অন্যান্য আসবাব-পত্র পাড়া-মহল্লার গরীব-মিসকিনকে দান করা মুস্তাহাব ও উত্তম। এটাকে ফরয-ওয়াজিব মনে করা অনুচিত ও অজ্ঞতা। তদ্রুপ এ ধরনের জায়েজ ও মুস্তাহাব আমলকে বিদআত, হারাম বলাও কোরআন-হাদীসে নাই বলা চরম গোমরাহী ও সীমালঙ্ঘন। অথচ মৃত ব্যক্তির কবরে ইসালে সাওয়াবের জন্য খানা-পিনার আয়োজন ও সাদকা খায়রাত ও নফল ইবাদতের বর্ণনা ক্বোরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যা ইতিপূর্বে বহুবার তরজুমান প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। তবে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সন্তান যদি এতিম/নাবালেগ অথবা একেবারে গরিব/অসহায় হয় তবে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা আত্মীয়-স্বজনদের উপর বাঞ্ছনীয়। তখন মায়্যেতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি জিয়াফত/ফাতেহার নামে ব্যয় করলে এতিম ও অসহায়দের প্রতি জুলুম হবে।

[যুগ-জিজ্ঞাসা, প্রকাশনায় আনজুমান ট্রাস্ট]

প্রশ্নঃ আমাদের এলাকায় দেখা যায় প্রায়ই বৃদ্ধ পুরুষ এবং মহিলা নামায আদায় করার জন্য চেয়ারে বসে দেয়ালে মাথা ঠুঁকে সিজদা দেয়। এ নামায সু সম্পন্ন হবে কিনা? জানালে উপকৃত হব।

উত্তরঃ একান্ত অপরাগতায় শারীরিক অসুস্থতা বা অক্ষমতার কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয বা বৈধ। তবে, যারা একান্ত বিশেষ প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায আদায়কালে রুকু বা সিজদার সময় মাথা দেয়ালে স্থাপন করা বা কোন উচু কাঠের উপর সিজদা করা জায়েজ নেই। কেননা নামাযের

বৈঠকের মত বসে বা চেয়ারে বসে নামায আদায়কালে নামাযির সামনে টেবিল ও উঁচু কিছু বেঞ্চ/বালিশ অথবা দেয়ালে সিজদা করা পবিত্র হাদীস শরীফ ও ফিকহ্ ফতোয়ার বর্ণনানুযায়ী নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে ইমাম বাজ্জাজ ও ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা, প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক অসুস্থ সাহাবীকে দেখতে গেলেন তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লঅহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার সম্মুখ হতে বালিশ সরিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি (রুগ্ন সাহাবী) কাঠি নিলেন তার উপর সিজদা করার জন্য। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাও সরিয়ে দিলেন। এরশাদ করলেন, যদি তুমি জমিনের উপর সিজদা করতে সক্ষমতা রাখ তবে অবশ্যই জমিনের উপর সিজদা করবে আর যদি অক্ষম হও মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করে সিজদা করবে।

[হাশিয়ায়ে হেদায়া, কৃত. আল্লামা আব্দুল হাই লখনৌভী, ১ম খন্ড, ১৪৪পৃ. ও রদ্দুল মোহতার, কৃত. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ.]

ইসলামি ফিকহের অন্যতম গ্রন্থ হেদায়ায় উল্লেখ রয়েছে-

ولاترفع الى وجهه شئ يسجد عليه لقوله عليه الصلوة والسلام ان قدرت ان تسجد على الارض فاسجدو الا فاوم برأسك (الحديث]

অর্থাৎ যে মুসল্লি দাড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম সে বসে নামায আদায় করবে, আর সিজদা করার জন্য কোন কিছু চেহারা বা কপালের দিকে উঠাবে না।

যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি তুমি জমিনে সিজদা করতে সক্ষমতা রাখ তবে জমিনে সিজদা করবে। আর যদি জমিনে সিজদা করতে সক্ষমতা না রাখ তবে মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করে সিজদা আদায় করবে।

[হেদায়া, সালাতুল মারিজ, ১ম খন্ড, ১৪৪পৃ. কৃত. ইমাম আল্লামা মরগিনানী হানাফী রহ.]

উপরোক্ত বর্ণনা হতে প্রতীয়মান যে, চেয়ারে বসে নামাজ আদায়কারী টেবিলে বা দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে সিজদা করলে আদায় হবে না। এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত জানতে মাসিক তরজুমান ১৪৩৬হিজরি, রমজান সংখ্যা দেখার অনুরোধ রইলো। মাসআলাটি নেয়াহত স্পর্শকাতর বিধায় সকলের সতর্কতা অপরিহার্য। উল্লেখ্য যে, যারা ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাযে দাড়াতে, স্বভাবগতভাবে রুকু-সিজদা করতে ও নামাযের বৈঠকের সময় জমিনে দু'জানু হয়ে বসে নামায আদায়ে সক্ষম তাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে উক্ত নামায ছহি/শুদ্ধ হবে না। পুনরায় নামাজের নিয়ম অনুযায়ী আদায় করতে হবে। চেয়ারে বসে নামায আদায় করা শুদ্ধ হবে ঐ ব্যক্তির জন্য যে বিশেষ ওজরের কারণে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার সময় দু'জানু হয়ে জমিনে মোঠেই বসতে পারে না।

[তাফহিমুল মাসায়েল, মুফতি-মুনিবুর রহমান ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ আব্দুর রহিম**
আনজুমান বক্স কালেক্টর
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

❖ **প্রশ্ন: ব্যাংক ডিপিএসে টাকা রাখলে যে লভ্যাংশ দেওয়া হয়, তা নিজে ব্যবহার করা জায়েজ হবে কিনা?**

📖 **উত্তর:** বর্তমান সময়ে ব্যাংকিং লেনদেনে ব্যাংকে টাকা জমা দানকারী (ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান)কে (ডিপিএস ও এফডিআর ইত্যাদি) আমানতের উপর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট হারে শতকরা হিসেবে যে ইন্টারেস্ট/সুদ প্রদান করে, যা গ্রাহকের দাবী ব্যতীত, তা বর্তমান যুগের কিছু কিছু মুফতি/ফক্বীহ্ যদিও সুদের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে মন্তব্য করেছেন। তবে মুহাক্কিক্ব ফোকাহায়ে কেরামের মতে তা সুদের অবকাশ হতে মুক্ত নয় বিধায় ব্যাংকে জমাকৃত টাকার উপর শতকরা হারে যে অতিরিক্ত লভ্যাংশ দেয়া হয় তা গ্রাহক গ্রহণ করে নিজের জন্য অথবা স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যবহার না করে গরীব-মিসকিন এবং অসহায় ব্যক্তিকে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দিয়ে দেবে। এটাই সতর্কতা ও নিরাপদ। তাছাড়া ঋণ/ধারের টাকার সাথে স্বইচ্ছায় লাভ/মুনাফা হিসেবে কিছু দিলে সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ঋণ কোনো মুনাফা/লাভ নিয়ে আসে তাও রিবা/সুদের অন্তর্ভুক্ত। [সুনানে বায়হাক্বী, ৫/৩৫০]

সুতরাং ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত প্রদানকৃত টাকা নিজে ব্যবহার না করে দুনিয়াবী কোন লাভ/ফায়দা বা সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত গরীব, মিসকিন ও অসহায়কে দিয়ে দেয়াই শ্রেয়।

[ফতোয়ায়ে রজভীয়া, কৃত. ইমাম আ'লা হযরত আহমদ রেযা রহ. ও অকারুল ফতোয়া, কৃত. মুফতি অকারুদ্দিন বেরলভী, রহ. ও যুগ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

মুহাম্মদ নাঈমুর রহমান
ছাত্র: এ.এস. রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়
পটিয়া, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ শাজরা শরীফ পাঠ করার নিয়ম কি? পড়ার সময় মা, বাবা ও মুরব্বীদের নাম সংযোজন করে পাঠ করা যাবে কিনা? জানালে ধন্য হব।

উত্তরঃ শাজরা শরীফ হলো খতমে গাউসিয়া ও গেয়ারভী শরীফ আদায়কালে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার মাশায়েখে হযরাতের নাম মোবারকের ওসিলা নিয়ে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুনাজাত। যেখানে প্রিয়নবী রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নাম মোবারক, আওলাদে রসূল, মাশায়েখ-হযরাত, ওলী-বুযুর্গদের নামের উসিলা নিয়ে উপস্থিত সকলেই মুনাজাত করেন। খতমে গাউসিয়া ও গেয়ারভী শরীফ এসব খতম যেহেতু সিলসিলায়ে কাদেরিয়ার মাশায়েখ হযরাত কর্তৃক প্রবর্তিত যা সুনির্দিষ্ট নিয়মে ও তরিকায় আদায়ের নির্দেশনা ও নিয়ম রয়েছে বিধায় নিয়ম ও নির্দেশনা মোতাবেক আদায় করা উচিৎ। তাই 'মাআফ করদে আয় খোদায়ে দোজাঁহা মেরে গুনাহ্, সৈয়্যদ আহমাদ শাহ্ কুতুবুল আউলিয়াকে ওয়াস্তে' এই পংক্তির স্থানে মা'আফ করদে আয় খোদায়ে মা-বাপ মেরে গুনাহ্ এভাবে পড়া ঠিক নয়। সাজরা শরীফে যেভাবে আছে সেভাবে পড়বে। নিজ হতে কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে পড়বে না। যাতে সাধারণ পীর-ভাই-বোনদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির আশংকা না হয় সুতরাং সাজরা শরীফে যেভাবে উল্লেখ রয়েছে, সেরূপ পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। যাতে মাশায়েখ হযরাতের নিয়ম অনুসরণ করা হয়। সুতরাং এসব পূণ্যময় খতম আদায় করতে গিয়ে ঝাগড়া-বিবাদ করা ও ফেতনা সৃষ্টি করা নিন্দনীয় ও ফয়েজ-বরকত হতে বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর।

প্রশ্নঃ আছরের নামাযের সময় আমার এলাকার মসজিদে আজান দেওয়ার পূর্বে পার্শ্ববর্তী মসজিদের আজান শুনে ৪ রাকাত সুন্নাত আদায় করি। ১০ মিনিট পর এলাকার মসজিদে আজান দেয়। মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, পুনরায় সুন্নাত পড়তে হবে। এ বিষয়ে শরিয়তের হুকুম জানতে চাই।

উত্তরঃ পঞ্জেগানা নামায আদায় ছহি-শুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো নামাযের ওয়াক্ত বা সময় হওয়া। অর্থাৎ যে ওয়াক্তের নামায আদায় করা হবে, সে নামাযের সময়, ওয়াক্ত হওয়া ফরয বা শর্ত। যেমন ফজরের নামায আদায়ের ওয়াক্ত, সময় হলো- সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত, যোহরের সময় সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে শুরু হয়, আর যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার তার মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জোহরের নামাযের সময় বিদ্যমান থাকে। আসরের সময় যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে, সূর্যাস্তের পর হতে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়ে নামাযের শাফাক (সাদা আভা) চলে যাওয়া/অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময় থাকে। শফাক বা সাদা আভা অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্ত এশার নামাযের ওয়াক্ত থাকে। সুতরাং এ সময়ে কেউ নামায আদায় করলে তার নামায আদায় হয়ে যাবে। আযান হোক বা না হোক, আযানের আওয়াজ শুনা যাক বা না যাক। মূলত জুমাসহ ফরয নামাযের জন্য আযান দেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তথা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। আর তাই নামাযের ওয়াক্ত শুরু হলে আযান দিতে হবে। ওয়াক্ত যদি হয়ে যায় আপনার আদায়কৃত সুন্নাত নামায শুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে। পুনরায় আদায় করতে হবে না।

[মুমিন কি নামায, দুররুল মুখতার, হিন্দিয়া, ইত্যাদি]

মুস্তাক আহমদ
বিজয় নগর, লক্ষীপুর

প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখলে করণীয় কি? এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসের কোন ব্যাখ্যা আছে কিনা? জানতে আগ্রহী

উত্তরঃ স্বপ্ন সম্পর্কে সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ اِبْنِ قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحِلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ [رواه البخاري]

অর্থাৎ জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আবু কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে এবং খারাপ স্বপ্ন বা স্বপ্নদোষ হয় শয়তানের পক্ষ থেকে।

[সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুত্ তাবীর]

হাদীসে পাকে আরো বর্ণিত রয়েছে যদি কেউ মন্দ স্বপ্ন দেখে তার ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি হতে সে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তিনবার

বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে এবং কারো নিকট তা প্রকাশ করবে না। তাহলে সে ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে। [বুখারী শরীফ, কিতাবুত্ তা'বীর]

স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে দেখার বিষয়ে প্রখ্যাত তাবেয়ী জলিলুল কদর স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যদি স্বপ্নে কেউ মৃত ব্যক্তিকে দেখে তাহলে তাকে যে অবস্থায় দেখবে সেটাই বাস্তব বলে ধরা হবে। কারণ সে (মৃত ব্যক্তি) এমন জগতে অবস্থান করছে যেখানে সত্য ব্যতীত আর কিছুই নেই। মৃত ব্যক্তিকে যা করতে বলতে শুনবে সেটাই সত্য বলে ধরা হবে। তবে যদি কেউ স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে ভালো পোশাকে পরিহিত অবস্থায় বা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে দেখে তাহলে বুঝতে হবে সে ভাল অবস্থায় আছে। আর যদি জীর্ণ-শীর্ণ স্বাস্থ্য বা খারাপ পোশাকে দেখে তাহলে বুঝতে হবে সে ভাল অবস্থায় নাই। তার জন্য তখন বেশি বেশি মাগফিরাত কামনা করবে ও দোয়া প্রার্থনা করবে। হযরত আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর জীবদ্দশায় স্বপ্নে দেখলাম যে তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ তাকে জানানো হচ্ছে, এটা কি করে হয়? কিন্তু এর কয়েকদিন পরে স্বপ্নটা সত্যি হয়ে গেল অর্থাৎ আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করা হল। উল্লেখ্য, পরবর্তী জগতটা সত্য, আর সত্য জগৎ হতে যা আসে তা মিথ্যা হতে পারে না। তবে যিনি এ ধরনের স্বপ্ন দেখে তার ঈমান ও আমল সুন্দর হতে হবে। তবে এ জাতীয় স্বপ্ন দেখলে ভয়ের কোন কারণ নাই, নেককার সুন্নি অভিজ্ঞ মুত্তাকি আলেমের নিকট গিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জেনে নেয়া উত্তম। [কিতাবু তা'বিরুর রু'ইয়া-আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ.]

গাজী মুহাম্মদ আলী নেওয়াজ
কাটিরহাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: সাফা ও মারওয়া সাঈ করা হয় কেন? শুনেছি এ পাহাড়ে মূর্তি ছিল। এ সম্পর্কে জানিয়ে ধন্য করবেন

উত্তর: সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। এটা চিরন্তন সত্য কথা। তা কুরআন করীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ـ الاية...

অর্থাৎ অবশ্যই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৫৮]

এক ওলী যিনি একজন সম্মানিত নবীর স্ত্রী এবং আরেকজন নবীর আম্মা যার নাম হযরত হাজেরা আলায়হাস্ সালাম। তিনি নিজের শিশু পুত্র ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামের জন্য পানির খুঁজে সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে ছুটাছুটি করেছিলেন এবং ওই ওসিলায় তাঁর নূরানী কদম পাহাড়দ্বয়ে পড়ে ছিল এবং হযরত হাজেরার এ পাহাড় ছুটাছুটি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছিল। তাই তাঁর এ স্মৃতিকে চির জাগ্রত রাখার জন্য মহান আল্লাহ্ পাহাড়দ্বয়কে নিজের কুদরতের নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। হজ্ব পালনকারীর জন্য উক্ত দুই পাহাড়ে সাঈ বা ছুটাছুটি করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। আর ওমরা পালনকারীর জন্য ফরয। কোন কারণে এটা বাদ পড়লে হজ্বের বেলায় তাতে দম দেওয়া ওয়জিব। আর ওমরার বেলায় পুনরায় আদায় করতে হবে। জাহেলিয়াত তথা অন্ধকার যুগে উক্ত পাহাড়দ্বয়ের দুটি মূর্তি ছিল। সাফা পাহাড়ে যে মূর্তি ছিল তার নাম আসাফ আর মারওয়া পাহাড়ে অবস্থিত মূর্তির নাম ছিল নায়েলা। কাফেরগণ যখণ সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছুটাছুটি করত: তখন তারা মূর্তিদ্বয়ে সম্মানের উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে স্পর্শ করত। ইসলামের আবির্ভাবের পর মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

[তাফসীরে কবির, সূরা- বাক্বারা, কৃত. ইমাম আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) খাযায়েনুল ইরফান, কৃত. মুফতি সৈয়্দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) ও তাফসীরে নুরুল ইরফান, কৃত. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ.)' ইত্যাদি]

মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ্
গাউসিয়া কমিটি, মুরাদনগর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: নেককার ব্যক্তির পাশে কবরস্থ হলে কোন উপকার (ফায়দা) আছে কিনা? দলীলসহ বিস্তারিত জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর: নেক্কার কবরবাসী তথা আল্লাহর প্রিয় মাকবুল বান্দার কবরের পার্শে মৃতদেরকে কবরস্থ করা অতীব উপকারী। নেক্কার বান্দার পাশে সমাধিত হতে পারা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এটা দ্বারা পার্শ্বস্থ কবরবাসীর অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। আযাবের উপযোগী হলে আযাব দূরীভূত হয়। গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে অপরিসীম কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়। আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। তাই প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে মৃতদেরকে নেককার বান্দার পাশে ও মাঝে সমাহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- সুলতানুল

মুফাস্‌সিরীন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় রচিত 'শরহুস্ সুদূর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'তোমরা নিজেদের মৃতদেরকে নেক্কারদের মাঝে দাফন কর। কেননা মৃত ব্যক্তির পার্শ্বস্থ বদকার প্রতিবেশির কারণে কষ্ট পায়, যেভাবে জীবিত ব্যক্তি দুষ্ট প্রতিবেশির কারণে কষ্ট পায়।' অনুরূপভাবে হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি এরশাদ করেছেন, আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের মৃতদেরকে নেক্কারদের মাঝে দাফন করতে। কেননা মৃত ব্যক্তি দুষ্ট খারাপ প্রতিবেশির কারণে কষ্ট পেয়ে থাকে, যেভাবে জীবিত ব্যক্তিরা খারাপ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পায়।' উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

جُنُوْبُهُ الْجَار السُّوْءِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ يَنْفَعُ الْجَارُ فِى الْاٰخِرَةِ قَالَ هَلَ يَنْفَعُ فِى الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَذَالِكَ يَنْفَعُ فِى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ তোমরা তাকে (মৃতকে) কবরস্থানের দুষ্ট প্রতিবেশি থেকে দূরে রাখ (বরং নেককার প্রতিবেশির পাশে দাফন কর) বলা হল হে আল্লাহর রসূল নেক্কার প্রতিবেশি পরকালে (কবরে) কি অপরের কল্যাণ করতে পারেন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, নেক্কার প্রতিবেশি দুনিয়াতে অপরের উপকার করে কি? তদুত্তরে বলল হ্যাঁ, নবীজি এরশাদ করলেন, সেভাবে নেক্কার কবরবাসী পরকালে (কবরেও) পার্শ্ববর্তি কবরবাসীর উপকার করতে পারে।

অপর এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعَ الْمُزْنِىْ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَنَ بِهَا فَرَأَه رَجُلٌ كَانهُ مِنْ اهْلِ النَّار فَاغتم لِذٰلِكَ ثُمَّ اُرِيَهُ بَعْدَ سَابِعَةٍ اَوْ ثَامِنَةٍ كَانهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَسَألَهُ قَالَ دُفِنَ مَعَنَا رَجُلٌ مِنَ الصَّالِحِيْنَ فَشَفَعَ فِىْ اَرْبَعِيْنَ مِنْ جِيْرَانِه فَكُنْتُ فِيْهِمْ - اَلْحَدِيْث

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে নাফে আল মুযনী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনা শরীফে একজন পুরুষ মারা গেল, তাকে সেখানে দাফন করা হল। একজন ব্যক্তি তাকে (স্বপ্নে) দেখল যে সে জাহান্নামী। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি এতে দুঃখিত হল। ৭/৮দিন পর তাঁকে (স্বপ্নে) ওই মৃত ব্যক্তিকে দেখানো হলো, যেন সে বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতঃপর ওই ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, উত্তরে সে বলল, আমাদের সাথে একজন নেক্কার ব্যক্তি দাফন হয়েছে, তিনি তাঁর প্রতিবেশি কবরসমূহ থেকে ৪০ জনের জন্য (আল্লাহর দরবারে) সুপারিশ করেছেন; আমিও তাদের অন্যতম। সুতরাং নেক্কার ও বুযুর্গ কবরবাসীর ওসীলায় পার্শ্বস্থ কবরবাসীদের কবর আযাব মাফ হয়ে যায় এবং আল্লাহর রহমত, বরকত ও কল্যাণ সাধিত হয়। তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত ও ক্বোরআন-সুন্নাহর ফয়সালা।

[শরহুস্ সুদূর, আনবায়নুল আযকিয়া ফী হায়াতিল আম্বিয়া: কৃত. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ., আল-বাচায়ের, কৃত. আল্লামা হামদুল্লাহ্ দাজভী রহ. এবং আমার রচিত 'যুগ জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি]

▤ দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা ▤ একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে ▤ প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। ▤ প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা: প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

প্রবন্ধ

হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবার (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র দৃঢ়তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে সাইয়্যেদুনা সিদ্দীক্ব-ই আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সব দিক দিয়ে যেই প্রথম হবার মর্যাদা ও বিশেষত্ব অর্জিত হয়েছে, তা সম্পর্কে মুসলমানগণ সর্বান্তকরণে অবগত আছেন। এমনকি অমুসলিম ও বিরোধীদের নিকটও তাঁর অবদানগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্বীকৃত। ইসলামের ইতিহাসে রসূল-ই করীম খাতামুন্ নবিয়্যীন হুযূর-ই পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর সিদ্দীক্ব-ই আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই একমাত্র ব্যক্তি দৃষ্টি গোচর হন, যিনি মজবুত দ্বীন-ইসলামের বাগানের এমন পরিচর্যা করেছেন যে, দুনিয়া যতদিন থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সেটার ফুল ও ফল দ্বারা তামাম দুনিয়ার মুসলমানগণ উপকৃত হতে থাকবে।

মূলত: খাতামুন্ নবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর এ বরকতময় সত্তা হিদায়তের ফোয়ারা হয়েছেন। নবী-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গ, এরপর প্রতিনিধিত্বের যেই হক্ব বা প্রাপ্য এ মহান ব্যক্তি আদায় করেছেন, সেটার উপর হতভম্ব ও আশ্বর্যান্বিত হয়ে যায়। ঈমান, ইয়াক্বীন, সমবেদনা, প্রাণ উৎসর্গ করণ, প্রেম ও ভালবাসার যেই মানদন্ড সিদ্দীক্ব-ই আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পেশ করেছেন, তা উপস্থাপন করা সাধারণ তো সাধারণ, বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্যও সম্ভব হবার কথা নয়। যদি কাউকে রসূল-ই আকরামের পবিত্র মন-মেজাজ অনুধাবনকারী বলা যায়, তবে সেটার সর্বাধিক উপযোগী সিদ্দীক্ব আকবারই হতে পারেন।

দুনিয়ার সমস্ত পয়গাম্বরের সাথী সহচরদের মধ্যে এমন কোন সাথী সহচরের উপমা-উদাহরণ পাওয়া যাবে না, যিনি নিজের সব কিছু- জান-মাল, পরিবার-পরিজন নিজ পয়গম্বরের উপর উৎসর্গ করে দিয়েছেন; এতদ্‌সত্ত্বেও যিনি একেবারে নিশ্চিন্ত ও প্রশান্তচিত্ত। ঈমান ও প্রাণোৎসর্গ করণে এমন উদাহরণ পাওয়া মুশকিল ব্যাপার যে, রসূল-ই পাকের ভালবাসায় নিজের যুবক ছেলের সামনে তাকে পিতা কতল করার জন্য শানিত তরবারি নিয়ে দন্ডায়মান হয়ে যাবেন।

প্রথম খোৎবা

খলীফাতুল মুসলিমীন হবার পর সিদ্দীক্ব-ই আকবার সর্বপ্রথম যে খোৎবা দিয়েছেন (যেই বক্তব্য পেশ করেছিলেন), তা তাঁর রাজনৈতিক কার্যতঃ প্রজ্ঞা ও চিন্তাধারার উন্নততম দৃষ্টান্তই এবং সারা দুনিয়ার শাসকদের জন্য জাজ্বল্যমান শিক্ষা। তিনি বলেন-

* হে লোকেরা! আল্লাহরই শপথ! আমার মধ্যে কখনোই আমীর কিংবা খলীফা হবার ইচ্ছা না কোন দিনে ছিলো, না কোন রাতে, না আমার ঝোঁক সেদিকে কখনো ছিলো আর না আমি কখনো আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য দো'আ-প্রার্থনা করেছি। অবশ্য আমার মনে এ ভয় জেগেছিলো যে, অন্যথায় কোন ফিৎনা উঠে দাঁড়িয়ে যাবে। (এ কারণে আমি এ গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছি।)

* আমার মধ্যে হুকুমত (রাজ্য শাসন) করার জন্য কোন আনন্দ নেই, বরং আমার উপর এমন এক মহা দায়িত্ব বর্তানো হয়েছে, যা পালন করার শক্তি আমার মধ্যে নেই। আর আমি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত, সেটাকে আমার আয়ত্বে আনতে পারবো না।

* আমার একান্ত ইচ্ছা ছিলো যে, আমার স্থলে কোন উত্তম ও জোরালো ব্যক্তি থাকবেন, যিনি এ গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। আমার দুর্বল স্কন্ধযুগল এ বোঝা উঠাতে পারে না। আমাকে তোমাদের সরদার বানানো হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের থেকে উত্তম নই।

* সুতরাং আমি যদি ভাল কিংবা উপকারী কাজ করি, তবে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি আমি মন্দ কিংবা ক্ষতিকর কাজ করি, তবে সে সম্পর্কে অবহিত করবে। সততা হচ্ছে আমানত, মিথ্যা হচ্ছে খিয়ানত।

* তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল, সে আমার নিকট সবল যে পর্যন্ত না আমি তার প্রাপ্য উদ্ধার করে দিই। আর সবল

ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল যে পর্যন্ত না তার নিকট থেকে অপরের হক নিয়ে নিই।

* ইন্‌শা-আল্লাহ্, তোমরা জিহাদ বর্জন করবে না। কেননা, যে কেউ তা বর্জন করেছে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই অপমাণিত করেছেন। আর যে সম্প্রদায়ে ব্যভিচার আম হয়ে যায়, খোদা তার মুসীবতকেও আম করে দেন। আমি আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করলে, তোমরাও আমার আনুগত্য করবে, কিন্তু যদি খোদা ও রসূলের নির্দেশ অমান্য করি, তবে তোমাদের উপর আমার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। আচ্ছা! এখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাও! আল্লাহ্ তোমাদের উপর দয়া করুন।"

এটা তাঁর ওই রাজনৈতিক কার্যত: প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ছিলো, যার ফলে শত্রু ও বন্ধু হয়ে গিয়েছিলো এবং গোটা সম্প্রদায় বা জাতি তাঁর ইমামত ও খিলাফতের উপর একমত হয়ে গিয়েছিলো।

অমুসলিমদের সাক্ষ্য

খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালনের পর রাজ্যে যেই অভ্যন্তরীণ ও বাইরের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি হয়েছে সেগুলোরে বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাস ও সিয়রের কিতাবগুলোতে মওজুদ রয়েছে। কিন্তু যে কার্যত কৌশলের মাধ্যমে সমস্ত ফিৎনা ও বিশৃঙ্খলা দমন ও দূরীভূত করে হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবার পুরো রাজ্যে শান্তি বহাল করেছিলেন তা ইসলামের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। উইলিম ম্যুরের মতো ইতিহাসবিদও তাঁর পুস্তকে একথা না বলে ক্ষান্ত হননি যে, হযরত আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বড় জ্ঞানী, সমঝদার এবং দুনিয়ার ঘটনাবলী সংকটপূর্ণ অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, বরং তিনি নিজ জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন।

হুযূর-ই আকরামের ওফাতের পরবর্তী ঘটনাবলী

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফ কোন মা'মুলী ঘটনা ছিলো না। একদিকে মুসলমানগণ শোকে মুহ্যমান ছিলেন, অন্যদিকে মুনাফিকগণ ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য তৎপর হয়ে ওঠে, মদীনা মুনাওয়ারার চতুর্পাশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে, অনেক দুর্বল ঈমানের গোত্র দ্বীন-ইসলাম ত্যাগ করতে লাগলো, ভণ্ড নবীগণ লোকজনকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার অপচেষ্টা চালাচ্ছিলো। এমতাবস্থায় বড় থেকে বড়তর কর্মব্যবস্থাপক এবং রাজনীতিবিদও সাময়িকভাবে হলেও দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেতে থাকেন, যেগুলো অবস্থাদি সংশোধনের পরিবর্তে আরো বিগড়ে ফেলে। এমন সময় রাজ্য শাসন ও রাজনীতিবিদদের চরম পরীক্ষা হয়। কিন্তু সাইয়্যেদুনা আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের দূরদর্শিতা, কার্যতঃ কৌশল এবং পূর্ণাঙ্গ স্থিরতা (দৃঢ়তা) দ্বারা সব সমস্যার সমাধান এমনভাবে সফল হয়েছিলেন যে, দুনিয়ার সব শাসক ও রাজনীতিবিদও হতবাক হয়ে যান। কখনো তিনি নিজের মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিন্দুমাত্র পিছু হটেননি। নবী-ই আকরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

উসামা বাহিনী প্রেরণ

গোটা রাজ্য বিভিন্ন বিপদে বেষ্টিত, অভ্যন্তরীন ও বহিঃশত্রুরা সুযোগের সন্ধানে অপেক্ষা রত, কিন্তু যে সৈন্য বাহিনীকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামার নেতৃত্বে রওনা করেছিলেন, সেটাকে রওনা করেই দিচ্ছেন। অথচ শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণও এটার বিপক্ষে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কিন্তু উম্মতে মুসলিমার সিদ্দীক্বের বক্তব্য শুনুন। তিনি বলেন, "যদি নেকড়েগুলোও আমাকে তুলে নিয়ে যায়, তবুও আমি এ সৈন্য বাহিনীকে প্রেরণ করবোই। আর যে সিদ্ধান্ত রসূলে আকরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিয়েছেন, তা আমি পূরণ (বাস্তবায়ন) করবোই। যদিও এসব বস্তিতে আমি ব্যতীত অন্য কেউ নাও থাকে, তবুও এ বাহিনী প্রেরণ করবোই।

এদিকে যখন হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নেতৃত্বের বিপক্ষে তাঁর স্বল্প-বয়স্কতার কারণে আশংকাদি প্রকাশ করা হচ্ছিলো, তখন হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবার বললেন, "এক ও লা শরীক আল্লাহ্‌রই শপথ! যদি রসূলে পাকের পবিত্র বিবিগণের পাগুলোকে কুকুরগুলো টানতে থাকে, তবুও আমি, যে সৈন্য বাহিনীকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরণ করেছেন, সেটাকে কখনো ফিরিয়ে আন্‌বোনা। আর যেই পতাকা খোদ হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেঁধে

দিয়েছেন, সেটাকে আমি কখনো খুলবো না।" সুতরাং উসামা-বাহিনী চলে গেলো। আর চল্লিশ দিন পর বিজয়ী বেশে ফিরে আসলো। চতুর্দিকে খুশীর ফোয়ারা প্রবাহিত হতে লাগলো। সাহাবা-ই কেরাম হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবারের দূরদর্শিতা, সুনিপূণ ব্যবস্থাপনা এবং রাজনৈতিক কর্মগত কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ওদিকে ইসলামের শত্রুদের অন্তরে এ সৈন্যবাহিনীর সাফল্য দাগ কাটছে। কেউ মদীনা মুনাওয়ারার দিকে চোখ তুলে দেখার দুঃসাহস করেনি।

খত্‌মে নুবূয়তের অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ

সিদ্দীক্ব-ই আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কর্মগত হিকমত বা কৌশল অনেক বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলো। তাঁর সময়ে যখন নুবূয়তের মিথ্যা দাবীদাররা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তখন তাদের দৃঢ় পদে মোকাবেলা করা হলো, যদিও তাদের দমন করতে গিয়ে অনেক জান ও মালের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। ভণ্ডনবী মুসায়লামা কায্‌যাবকেও দমন করতে গিয়ে হাজারো মুসলমান, যাঁদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক হাফেযে ক্বোরআন শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু বিজয় মুসলমানরাই অর্জন করেছিলেন। আর এভাবে 'খতমে নুবূয়ত'-এর আক্বীদা স্থায়িত্ব লাভ করলো। ক্বিয়ামত পর্যন্ত মিথ্যা নুবূয়তের দাবীদাররা শিক্ষা পেয়ে গেলো, মুসলিম উম্মাহ্ হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সুন্নাত অনুসারে আমল করতে গিয়ে কোন ভণ্ড নবীকে সহ্য করবেন না। এ পদক্ষেপেএ দৃষ্টান্ত কায়েম করা হয়েছে। আর মুসলমান শাসকদেরকে একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদ আক্বাইদ ও আমলগুলোতে কোন প্রকারের শিথিলতা অবলম্বন করা যাবে না। দ্বীনকে সেটার সহীহ বুনিয়াদের উপর কায়েম করা এবং সেটার নবীতিমালা অনুসারে কাজ করা প্রত্যেক মুসলমান শাসকের জন্য জরুরী।

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ

এ বিষয়ে হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোনরূপ ছাড় দেননি; সাহাবা-ই কেরাম, যাঁদের মধ্যে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও ছিলেন, বিরুদ্ধবাদীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঠিক পথে আনার (تاليف قلوب) পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর তাঁরা বলেছিলেন, "যেসব লোক তাওহীদ ও রিসালতকে স্বীকার করছে, শুধু যাকাৎ দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, তাদের উপর কিভাবে তলোয়ার উঠানো যাবে?" কিন্তু সিদ্দীক্ব-ই আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জবাবে বললেন, "আল্লাহরই শপথ! যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবদ্দশায় ছাগলের বাচ্চা যাকাৎ হিসেবে দিতো, যদি সে তা দিতেও অস্বীকার করে, তবে আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ করবো।" এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, "যদি আজ তাদেরকে যাকাৎ না দেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়; তবে তারা আগামীতে নামায-রোযাকে অস্বীকার করবে। এভাবে দ্বীন একটি তামাশার বস্তু হয়ে যাবে।"

মোটকথা, সাইয়্যেদুনা হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকাবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অত্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রস্তুতি গ্রহণের সাথে যাকাৎ প্রদানে অস্বীকারকারী সকল গোত্রের মোকাবেলায় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে এমন জোশ্ ছিলো যে, বনু আবাস ও বনু যুবিয়ানের মোকাবেলায় তিনি নিজে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে পরাজয়ে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর প্রস্তুতি ও দৃঢ়তার কারণে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত যাকাৎ অস্বীকারকারী যাকাৎ পরিশোধ করে দিলো। কেউ কেউ তো নিজেরাই মদীনা মুনাওয়ারায় এসে 'বায়তুল মাল'-এ তা জমা করে দেয়।

এভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের ধর্মীয় সুক্ষদৃষ্টি, সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধি, দৃঢ়তা ও স্থিরতা দ্বারা তিনি সমস্ত ফিৎনা ও বিদ্রোহগুলো হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের পর এক সাথে দূরীভূত ও দমিত হয়ে গিয়েছিলো।

বিভিন্ন রাজ্য বিজয়

সিদ্দীক্ব-ই আকবার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কার্যত কৌশল ও সুনিপুণ ব্যবস্থা দ্বারা শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের ভিতরে বাইরে বিরাজিত যাবতীয় ফিৎনা ও বিশৃঙ্খলাকে পদ দলিত করে দেশে শান্তি পুন:প্রতিষ্ঠা করেননি, বরং বিভিন্ন রাজ্য জয়ের বিজয় নিশানও উড্ডীন করেছেন। তিনি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ, ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ান, আবূ ওবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্, শুরাহ্‌বীল ইবনে হাসানাহ্ এবং আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম এবং অন্যান্য সিপাহসালারের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছেন। বিশেষ করে ইরাক ও সিরিয়া বিজয় সম্পন্ন করেছিলেন। ইরানে সৈন্য পাঠিয়ে সেখানকার কিল্লাগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান শাসকদেরও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের কর্ম পদ্ধতি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। অবশ্য সেটা তখনই সম্ভব হবে, যখন শাসকগণ সৎ কর্মপরায়ণ ও যোগ্য হন এবং তাঁদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার ইশ্‌ক্ব ও ভালবাসা এবং সাহাবা-ই কেরামের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আস্থা বদ্ধমূল থাকে। সর্বোপরি তারা যদি বিশ্ব নবী ও তাঁর সাহাবীদের আদর্শ বাস্তবায়নে আন্তরিক হন।

লেখক: মহাপরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

সাঙ্গ হবে রঙ্গ ভবের

হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

সমস্ত প্রশংসা, গুণগান ও স্তুতির মৌলিক হকদার আল্লাহ্ তাআলা যিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, শাশ্বত, অবিনশ্বর। তাঁর পবিত্রতা ও কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনে পবিত্র বিধান আরোপ করে মহিমা ও সৌন্দর্যে ধন্য করেছেন। যাতে পরকালীন স্থায়ী জীবনে আমরা অনাবিল সুখ-শান্তি ও অফুরন্ত নেয়ামতে সমৃদ্ধ হতে পারি।

আমাদের মনের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারোক্তি হলো, আল্লাহ্ তাআলা এক, অদ্বিতীয়, অক্ষয়, অমর। একমাত্র উপাস্য তিনিই। তিনি স্রষ্টা, জীবনদাতা, পালনকর্তা, একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া উপাস্য নেই। আমাদের ইহ জীবনের সুন্দরতম সর্বকালের সর্বোত্তম আদর্শ সায়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ রাসুল, তাঁরই উপাসনাকারী বান্দাহ্।

মাহে জমাদাল উলা অতিবাহিত, মাহে জমাদিউস্ সানি সমাগত। একের পর এক আগত ও বিগত মাসগুলো আমাদের জীবনযাত্রার মাইলফলক'র মত। যেগুলো বারে বারে মনে করিয়ে দেয় আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সমাগত হচ্ছে ক্রমান্বয়ে, শেষ হয়ে আসছে ইহজীবনের এ যাত্রা। কুরআনে করীম-এ মৃত্যুর কথা 'জীবন'র আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা মূলক'র প্রথমেই আছে বরকতময় সে সত্তা। যাঁর কুদরতের কব্জায় রয়েছে সৃষ্টিজোড়া রাজত্ব। আর তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি তোমাদের পরীক্ষা করে দেখবেন, তোমাদের মধ্যে কে সুন্দরতম আমলকারী। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।' (৬৭:১-২) বলা যেতে পারে, মৃত্যুর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য জীবনের সৃষ্টি। এ জীবন ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী। তবে মানবজীবন অর্থহীন নয়। পরকালে ইহ-জীবনের কর্মময় জীবনের অনুপুঙ্খ হিসাব নেয়া হবে। সে কর্ম ভালো হোক বা মন্দ-তার সমুচিৎ পুরস্কার বা শাস্তিও বান্দাকে গ্রহণ করতে হবে। আমরা যতই সুখে বা দুঃখে, আনন্দে বা কষ্টে থাকিনা কেন, এ পৃথিবীর সমুদয় মায়া কাটিয়ে আমাদেরকে যেতেই হবে। যে দেশ আমাদের অজানা, অচেনা- সেখানেই আমাদের যেতে হবে। যেতে যত কষ্টই লাগুক, ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়া আমাদের কাটাতেই হবে। পবিত্র কুরআনে, নবীজির হাদীসে কথাটি বারবার ফিরে ফিরে আসছে। জগৎ সংসারের এক বিচিত্র ব্যাপার এটাই যে, জাগতিক জীবনে আমাদের যদি স্থানান্তরে যাত্রা করার প্রয়োজন হয়, তখন সাময়িক গন্তব্যে গমনের জন্য আমরা সাধ্যমত আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়ার পর্যাপ্ত, রসদসহ ভ্রমণের সবকিছু প্রস্তুতি যোগাড় ও নিশ্চয়তা সম্পর্কে বারবার অবহিত হতে চেষ্টা করি। পরিবহন, অবস্থান কোনটি সহজতর ও স্বচ্ছন্দ হবে, তা নিশ্চিত হই। অনেকে ভ্রমণকালীন পথঘাট চেনা ও সময় বাঁচানোর জন্য গাঁটের অধিক পয়সা খরচ করে গাইডও যোগাড় করি। পার্থিব জীবনের এসব ভ্রমণ প্রয়োজনে পরিবর্তন হতে পারে, বা কর্মসূচি বাতিলও হতে পারে। অথচ পরযাত্রার দিন তারিখ, সময়সূচি অনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও সফর যে সুনিশ্চিত, তা অস্বীকার করি না আমরা কেউই। কিন্তু না ফেরার দেশে নিশ্চিত যাত্রার কথায় দৃঢ় বিশ্বাস রেখেও তার জন্য যথার্থ প্রস্তুতির কথা দূরে, স্মরণ করে সতর্ক থাকার জন্য আমাদের কয় শতাংশ মনোযোগী বা যত্নবান? ভাবি, সে পরিসংখ্যান'র প্রয়োজনই বা কী? হয়তো এ কথা বলার কারণে কর্মজীবী ব্যস্ত লোকের অনেকেই আমার জন্য 'হাঁদা, মধু জাতীয় কোন বিশেষণের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। যতই সুখে আমাদের সময় কাটুক, মৃত্যু আমাদেরকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে, এই ধ্রুব ও মহাসত্যকে আমরা ভুলে যাবো কেন? আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বচন-ভিন্নতায় একথাটি আমাদের জন্য কতবার উল্লেখ করেছেন। তাগাদার জন্য এ পুনরুক্তি। তাহলে ভুলে থাকায় কৃতিত্ব কী?

পবিত্র কুরআনের অমোঘ বাণী আরেকটি শুনি? মহান স্রষ্টা, যাঁর ইচ্ছায় আমাদের জীবন–মৃত্যু, তিনি বলেন, 'যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে নাগালে পাবেই–যদিও তোমরা মজবুত কেল্লার ভেতরেও অবস্থান করো [৪:৭৮] মুসলিম সম্প্রদায়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রত্যেকেই এ আয়াত শুধু জানেন, তা-ই নয়; বরং কথায় কথায় আওড়ানও। তা হলো, 'কুল্লু নাফসিন যা-য়িক্বাতুল মাওত'। অর্থাৎ প্রাণিমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। পবিত্র কুরআন মজীদে এ বাণী বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। তবুও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই আমরা তা বেমালুম ভুলে থাকি। সব কথা ভুলে থাকাই কি নিরাপদ, বা বুদ্ধিমানের কাজ? সুরা নিসার ৭৮তম যে আয়াতটির (আংশিক) তর্জমা উদ্ধৃত

হয়েছে, সেটার শেষ দিকে উপসংহকারধর্মী অংশে বলা হয়েছে, 'ফলত সে সম্প্রদায়গুলোর কী পরিণতি হবে, যারা কোন কথাই অনুধাবনের চেষ্টা করে না?' যতোই আমরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, আরামে-আয়েশে কালাতিপাত করি না কেন, ইহজীবনের সংক্ষিপ্ত সময়কাল যে দ্রুত ফুরিয়ে যায়। উল্লেখিত প্রসঙ্গেরও কিছু আগের দিকে একটু আলোকপাত করা যাক। হিজরতের পূর্বে সম্প্রদায়গত শত্রু কর্তৃক অমানুষিক নির্যাতনের প্রেক্ষিতে মক্কার কিছু বিক্ষুব্ধমনা মুসলমান বলাবলি করেছিল, 'মুসলমানরা এ নির্যাতনের প্রেক্ষিতে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ কেন হচ্ছে না? তারাই আবার হিজরতের পর শান্তির পরিবেশে মদীনা শরীফে অবস্থানকালে জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ায় বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারা কামনা করছিল, এখন এ নির্দেশ না এসে আর কিছুদিন এ অবকাশ বিলম্বিত হতে পারত না! আল্লাহর ইরশাদ, 'দুনিয়ার ভোগ-বিলাস খুব অল্প; মুত্তাক্বীদের জন্য আখেরাত'র (পুরস্কার)ই উত্তম।' বাস্তবিকপক্ষে আমাদের আয়ু আরো স্বল্প। যা ভোগ করার তীব্র বাসনায় আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে চলছি প্রতিনিয়ত। দিন-রাত মিছে মরীচিকার পিছনে হন্যে হয়ে ছুটছি। জানি না, আদৌ আমাদের বোধোদয় হবে কিনা।

শেষ যমানা বড়ই দুঃসহ। মানুষের মাঝে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাবে বিভীষিকাজনক হারে। অহঙ্কার প্রদর্শনের প্রক্রিয়া হবে জঘন্যতম অপরাধ বৃদ্ধির ভয়াবহ রূপ। সমাজের মান্যবর ব্যক্তিবর্গ জড়িয়ে পড়বেন ঘৃণ্য সব অপরাধে। যারা শাসন করবে, বারণ করবে, যারা উপদেশ দেবে তাদের মাঝেই সংক্রমিত হবে অপরাধের ভাইরাস। অনেককাল আগেই উসওয়ায়ে হাসানা'র প্রতিবিম্ব, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, অদৃশ্যজ্ঞানের ধারক নবী, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মতের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের অন্তরগুলো হবে বাঘের (অন্তরের) মত, তাদের (বাহ্যিক মুখের) কথা হবে নবীদের বাণীর মত (মধুর বচনে সদুপদেশ), আর তাদের কার্যকলাপ হবে ফিরআউনের মত'। (অর্থাৎ নির্দয়, নির্মম, অবলীলায় পাখির মত গণহত্যা, নির্বিচারে ভালো মানুষদের জান-মাল ধ্বংস করা ইত্যাদি)।

সমাজের গণ্যমান্য অনুসরণযোগ্য শ্রেণির মানুষগুলোর চরিত্র হবে ভয়াবহ। তাদের জন্য আল্লাহর রাসূল জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, 'তিন শ্রেণির লোক জাহান্নামে যাবে। ১. জালিম শাসক (সাধারণ প্রজার যাঁরা নিরাপত্তার যিম্মাদার), ২. মিথ্যুক আলেম, (নিজেদের রুটি-রুজির জন্য যারা ধর্মের মিথ্যা অপব্যাখ্যা দেবে, ৩. ব্যভিচারী বৃদ্ধ (বয়সে ও যাদের সুমতি আসে না)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আর একটি অমীয় বাণী উল্লেখ করতঃ আজকের প্রসঙ্গের ইতি টানা হবে। তিনি ইরশাদ করেন, ছয় শ্রেণির মানুষের প্রতি আমি অভিসম্পাত দেই, আল্লাহ ও তাদের প্রতি অভিসম্পাত দিয়েছেন। ১. যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবে নিজ থেকে কিছু যোগ করে, ২. যে তাকদীর অস্বীকার করে, ৩. যে জোর পূর্বক মুসলমানদের নেতৃত্ব দখল করে, যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেছে, তাকে সে সম্মানের আসনে সমাসীন, আর তিনি যাঁকে সম্মানিত করেন সে তাঁকে লাঞ্ছিত করে, (এর উদাহরণ ইয়াযীদ), ৪. যে আল্লাহর কৃত হারামকে হালাল জানে (অর্থাৎ মক্কার হেরমে খুন-খারাবি ও শিকার করে), ৫. যে আমার বংশধর ও সন্তান-সন্ততির মান হানি করে, ৬. যে আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে। (মেশকাত শরীফ দ্র:) স্বল্প এ জীবনে ভোগের লিপ্সা বর্জনীয়।

লেখক : আরবী প্রভাষক-জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্রাসা।

ফীহি মা ফীহি

মূলঃ মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী

[রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

অনুবাদঃ কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন, “রাত দীর্ঘ, তোমাদের ঘুম দ্বারা তাকে কমিয়ে ফেলো না। দিন উজ্জ্বল, তোমাদের পাপ দ্বারা তাকে অন্ধকার করো না।”

অন্যদের কৃত চিত্তবিক্ষেপ, কিংবা শত্রু-মিত্রের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ব্যতিরেকেই তোমাদের সবচেয়ে গোপন বিষয় ও চাহিদাগুলো (মহাপ্রভুর দরবারে) আরয করার জন্যে রাত-ই হলো দীর্ঘ সময়। খোদা তা'আলা এই সময় অন্যদের চোখে যখন পর্দা টেনে দেন, তখন তোমাদেরকে শান্তি ও একান্ত গোপনীয়তা মঞ্জুর করা হয়, যাতে তোমাদের আমল (পুণ্যদায়ক কাজ) সততা ও সত্যনিষ্ঠাসহ এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই কৃত হয়।

রাতে মোনাফেক (কপট) লোকের কপটতা প্রকাশ পায়। পৃথিবী হয়তো রাতের অন্ধকারে ঢাকা থাকতে পারে এবং দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখা যেতে পারে, কিন্ত রাতে কপট লোক সৎ ও আন্তরিক মানুষ হতে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়।

কপট লোক বলে, “যেহেতু কেউই দেখছে না, এমতাবস্থায় কার খাতিরে আমি ভান করবো?”

কেউ একজন তো অবশ্যই দেখছেন, কিন্তু মোনাফেকের চোখ একদম বন্ধ এবং সে ওই মহান সত্তাকে দেখতেই পাচ্ছে না।

বিপদে প্রত্যেকেই সাহায্য চায়; দাঁতের ব্যথায় ও কানের যন্ত্রণায়, সন্দেহ, ভয়–ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতায়। গোপনে প্রত্যেকেই আরযি পেশ করে এই আশায় যে ওই মহান সত্তা তাদের দোয়া কবুল করে প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন। একান্তে, গোপনে মানুষেরা দুর্বলতা দূর করার ও নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে নেক আমল পালন করে এই আশায় যে, ওই চিরঞ্জীব সত্তা তাদের উপহার ও প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করবেন। যখন তাদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয় ও মানসিক শান্তি ফিরে আসে, তখন অকস্মাৎ তাদের বিশ্বাস মিলিয়ে যায়, আর দুশ্চিন্তার ভূত আবারো ঘাড়ে চেপে বসে।

এমতাবস্থায় তারা আবার আরয করে, “হে খোদা, আমরা এমন-ই এক শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছিলাম যখন সমস্ত আন্তরিকতাসহ আমাদের কয়েদখানার কোণা থেকে আমরা আপনার কাছে আরয করেছিলাম। এক শ প্রার্থনার ওয়াস্তে আপনি আমাদের আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। এক্ষণে কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়েও আমরা ওই রকম-ই অভাবগ্রস্ত আছি। আমাদেরকে এই অন্ধকার দুনিয়া থেকে বের করে পয়গম্বর আলায়হিমুস্ সালামবৃন্দের আলোকোজ্জ্বল জগতে নিয়ে আসুন। মুক্তি কেন কয়েদখানা ও দুঃখ- বেদনা ছাড়া আসে না? এক হাজারটি ভালো ও ধোকাপূর্ণ উভয় ধরনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের গ্রাস করে রেখেছে; আর এসব ভূতের দ্বন্দ এক হাজারটি পীড়ন ও যন্ত্রণা নিয়ে আসে যা আমাদের করে থাকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। সকল ভূতকে জ্বালিয়ে খাক করা সেই নিশ্চিত বিশ্বাসটি কোথায়?”

আল্লাহ তা'আলা উত্তর দেন, “তোমাদের মাঝে আনন্দ-ফুর্তির অন্বেষণকারী সত্তা (নফস্) তোমাদের শত্রু এবং আমারও শত্রু।

“তোমাদের শত্রু ও আমার শত্রু যে সত্তা,
মিত্র বলে তাকে গ্রহণ করো না।'

আনন্দ-তালাশী নফস (একগুঁয়ে সত্তা)-কে যখন বন্দী করা হয়, আর সে দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়, তখন-ই তোমাদের স্বাধীনতা আগমন করে এবং শক্তি সঞ্চয় করে। এক হাজার বার তোমরা প্রমাণ করেছো যে মুক্তি তোমাদের কাছে এসেছে দাঁতের ব্যথা, মাথায় ব্যথা ও ভয়–ভীতির মাধ্যমে । তাহলে কেন তোমরা শারীরিক শান্তি-স্বস্তির শেকলে আবদ্ধ থাকবে? কেন তোমরা শরীরের মাংসের সেবায় সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকবে? (ওপরের) ওই সূত্রের শেষটুকু ভুলে যেয়ো না; দেহের ওই কামনা-বাসনার জট খোলো যতোক্ষণ না তোমাদের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা তোমরা অর্জন করেছো, আর অন্ধকার কয়েদখানা থেকে মুক্তিও খুঁজে পেয়েছো।”

লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ইসলামী গবেষক।

পেট ফেঁপে গেলে যা খাবেন

হজমে সমস্যা হলে পেটে গ্যাসের সৃষ্টি হয় যার কারণে পেট ফুলে থাকে বা ফেঁপে থাকে। এই সমস্যার নিরাময়ে ঘরোয়া কিছু সমাধান গ্রহণ করতে পারেন। পেট ফাঁপা হলে খাবেন যেসব খাবার।

আদা: পেট খারাপের একটি পরিচিত প্রাকৃতিক চিকিৎসা হচ্ছে আদা। এটি সেসব খাবারের একটি যা পেট ফাঁপা ও হ্রাস করতে পারে। 'এটি হজমে সাহায্য করে এবং পেটের বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়।'

পানি: পেট ফাঁপা দূর করতে আদার চকলেট, আদার চা এবং দইয়ে তাজা আদা যোগ করে খেতে পারেন। পেট এমনিতেই ফুলে আছে, তাই পানির কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছেন? 'সাধারণ পানি আপনার পেট ফাঁপা কমাতে ভূমিকা রাখে।' পানিকে সুস্বাদু করতে এতে শসা, কমলা অথবা লেবুর স্পইন যোগ করতে পারেন।

কেফির ও দই: যদি দুগ্ধজাত খাবার আপনার জন্য সমস্যা না হয়, তাহলে কেফির (ফার্মেন্টেড মিল্ক বেভারেজ) এবং দই খেতে পারেন। পুষ্টি বিশেষজ্ঞ রেনে ফিসেক বলেন, উভয়টিতেই প্রোবায়েটিকস থাকে, যা পেট ও শরীরের জন্য ভালো এবং পেট ফাঁপায় কার্যকর। কেফির ও দই অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি করে, যা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাককে অধিক কার্যকরভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। ফলে আপনার গ্যাস জমা ও পেট ফাঁপা হওয়ার প্রবণতা কমে যাবে।'

শসা: শসা পেট ফাঁপা কমাতে পারে। ফিসেক বলেন, 'শসা ফাইবারে ভরা, যা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাককে ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।'

টমেটো: পেট ফাঁপা হ্রাসের জন্য টমেটো চমৎকার। সিসেক বলেন, 'টমেটো পটাশিয়ামে সমৃদ্ধ, যা শরীরে সোডিয়ামের মাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে, এর ফলে পানি জমা ও পেট ফাঁপা হ্রাস পায়।'

পেঁপে: পেঁপে দেখতে সুন্দর, খেতে সুস্বাদু, এটি পেট ফাঁপা হ্রাসে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। 'একটি ছোট গবেষণায় পেঁপের সাপ্লিমেন্ট গ্রহণকারীদের গ্যাসীয় সমস্যা হ্রাস পেয়েছিল, যার মধ্যে পেট ফাঁপাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মৌরি: মৌরি আপনার পেট ফাঁপা হ্রাস করতে পারে। মৌরির বীজ খেতে পারেন অথবা মৌরি চা পান করতে পারেন। ডা. নিকো বলেন, 'গবেষণায় দেখা গেছে যে, মৌরি গ্যাসের প্রতিক্রিয়া এবং পেট ফাঁপা হ্রাসের জন্য চমৎকার উৎস, এ ছাড়া অন্যান্য উপকার তো আছেই।

পিপারমিন্ট: পিপারমিন্টের চা চমৎকার। পিপারমিন্ট একটি থেরাপিউটিক হার্ব, যা অনেক ডাইজেস্টিভ সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে পেট ফাঁপাও আছে। পিপারমিন্ট চায়ের মধ্যে পুদিনা পাতার চা অন্যতম।

অ্যাসিডিটি দূর করার সহজ উপায়

ভাজাপোড়া কিংবা মশলাদার খাবার খেলেন। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হল অ্যাসিডিটির অত্যাচার। এই ভয় থেকেই অনেকে খাবার তালিকা থেকে বাদ রাখেন প্রিয় খাবারগুলোও। পেটের গ্যাসট্রি গ্রন্থির মাধ্যমে অত্যধিক পরিমাণে অ্যাসিড উৎপন্ন হলে শরীরে নানাভাবে তা সমস্যার সৃষ্টি করে। সাবধানতা অবলম্বন না করলে গ্যাসট্রিক আলসার পর্যন্ত হতে পারে। কখনো কখনো কোনো অসুখের উপসর্গ হলো অ্যাসিডিটি। বুক, পেট, গলার মধ্যে জ্বালাদায়ী অস্বস্তি, ঢেঁকুর, বমি ভাব, ভরা পেট, জিহ্বা বিস্বাদ হয়ে থাকা ইত্যাদি অ্যাসিডিটির মূল লক্ষণ। অসময়ে খাওয়া, মশলাযুক্ত খাবার, অনিয়ন্ত্রিত চা-কফি, ধুমপান ও মদ্যপান, পেটের নানা ব্যাধি, ব্যথা কমার ওষুধ সেবন নানা কারণেই এই অ্যাসিডিটি হানা দিতে পারে শরীরে। অ্যাসিডিটি থেকে বাঁচতে ঘরোয়া উপায় জানা থাকলে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ। প্রতিদিন সকালে একগ্লাস হালকা গরম পানিতে একটি লেবু নিংড়ে দিন। এই পানীয় গরম গরম পান করুন। লেবু শরীরের টক্সিন দূর করে শরীরকে অম্লমুক্ত রাখে। গরম পানিতে মেশানোর কারণে লেবুর অম্লতাও শরীরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একটি পাত্রে আদা কুচি, মৌরি ও কাঁচা আমলকি মেশান। খাওয়া-দাওয়ার পর অল্প পরিমাণ নিয়ে চিবিয়ে খান এই মিশ্রণ।

অনেকেই পুদিনা পাতা খেতে ভালবাসেন। ভারী খাওয়া-দাওয়া হলে কয়েকটি পুদিনা পাতা চিবিয়ে খেয়ে নিন। এলাচ ফুটিয়ে সেই পানি পান করতে পারেন। এলাচ প্রাকৃতিকভাবেই অম্লতা বিরোধী। অনেকেই খাওয়ার পরে জোয়ান বা মৌরি মুখে রাখতে পছন্দ করেন। কেউবা পান খান। জোয়ান বা মৌরি অম্লতা দূর করতে কার্যকর, কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে খেলে শরীরের ক্ষতি। তাই এই দুটিই অল্প পরিমাণ খান। তবে পান না খাওয়াই ভালো।

[সূত্র: ই-টাইমস]

রোগ প্রতিরোধ করবে বেল

ফলের মধ্যে বেল একটি উল্লেখযোগ্য ফল। এটি ছোট-বড় সবার কাছে অতি পরিচিত। গরমে বা ঠান্ডায় এক গ্লাস বেলের শরবত হলে নিমেষেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। নানান গুণের জন্য আমরা বেল খেয়ে থাকি। কারণ, বেলে আছে নানান ঔষধি গুণ, যা আমাদের দেহের অনেক উপকার করে থাকে।

বেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, এ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাসিয়াম। বেলে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে, যা স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে। এটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সর্দি-কাশি ও ছোঁয়াচে রোগ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। ভিটামিন এ আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে, রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে। ডায়রিয়া ও আমাশয় রোগ সারিয়ে তোলে। অন্ত্রের কৃমিসহ নানা রোগজীবাণু ধ্বংস করে।

নিয়মিত বেল খেলে এর ল্যাকটিভ কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মুখের ব্রণ দূর করে। এতে ত্বক ভালো থাকে। বেল পাকস্থলীর আলসারসহ নানা সমস্যা দূর করে। বেলের উপাদান মিউকাস মেমব্রেনের গঠনে সহায়তা করে এবং চামড়ার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে।

বেলের ভিটামিন বি-১ ও বি-২ হৃৎপিণ্ড ও লিভার ভালো রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত বেল খেলে কোলন ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা কমিয়ে দেয়। বেলে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ, যা মুখের ব্রণ সারাতে সাহায্য করে। যাদের পাইলস আছে, তাদের জন্য নিয়মিত বেল খাওয়া উপকারী। বেলের পুষ্টি উপাদান চোখের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অংশগুলোর পুষ্টি জোগায়। ফলে চোখ যাবতীয় রোগ থেকে রক্ষা পায়। বেলের শাঁস ত্বককে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে এবং ত্বকের স্বাভাবিক রং বজায় রাখে।

[জহিরুল আলম শাহীন]

পা জ্বালাপোড়া করলে

পা জ্বালাপোড়া করা বা বার্নিং ফিট সিন্ড্রোম অপরিচিত কোনো রোগ নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই সমস্যায় ভুগছেন। তবে ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সে এবং ৫০ বছরের উর্ধ্বে যে কেউ এ রোগে আক্রান্ত হয়। পুরুষের তুলনায় মেয়েরা এ রোগের শিকার হন বেশি। পায়ের তলা ছাড়াও গোড়ালি, পায়ের ওপরিভাগ জ্বালাপোড়া ও ব্যথা হতে পারে। অনেক সময় রং পরিবর্তন হয়, অতিরিক্ত ঘাম হয় এবং পা ফুলে যায়। চাপ প্রয়োগ করলে কোনো ব্যথা অনুভূত হয় না। মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক অনুভূতি ও অবশভাব হয়। জ্বালা ও ব্যথা রাতে বেড়ে যায় এবং প্রায় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এ ধরনের উপসর্গ থাকে না।

পা জ্বালাপোড়া করার কারণ

১. ভিটামিন বি'র উপাদান যেমন থায়ামিন (বি-১), পাইরোডোক্রিন (বি-৬), সায়ানোকোবালামিন (বি-১২), নিকোটানিক অ্যাসিড ও রাউবোফ্ল্যাভিনের অভাবে পা জ্বালা এবং ব্যথা করে। ২. পরিবর্তিত বিপাকীয় ও হরমোনের সমস্যা (ডায়াবেটিস, হাইপোথাইরোডিজম)। ৩. কিডনি ফেইলুর (হিমোডায়ালাইসিস রোগী)। ৪. যকৃৎ (লিভার) ফাংশন খারাপ। ৫. কোমো থেরাপি। ৬. দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত মদপান। ৭. ইলফিটিং বা ডিফেক্টিভ জুতা পরিধান। ৮. অ্যালার্জিজনিত কাপড় ও মোজা ব্যবহার করা। ৯. বংশানুক্রমিক অসঙ্গত স্নায়ু পদ্ধতি। ১০. স্নায়ু ইন্‌জুরি, অবরুদ্ধ (ইন্ট্রাপমেন্ট) ও সংকোচন (কমপ্রেশন)। ১১. মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিও এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হন।

করণীয়: চিকিৎসার শুরতেই রোগের ইতিহাস, রোগীর শারীরিক ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার রোগীকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, প্রতিকার ও চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সুপরিমাপের খোলা ও আরামদায়ক জুতা পরিধান করতে হবে। আরামদায়ক সুতার মোজা ব্যবহার করা উত্তম। পায়ের আর্চ সাপোর্ট, ইনসোল ও হিল প্যাড ব্যবহারে উপসর্গ লাঘব হবে। পায়ের পেশির ব্যায়াম ও ঠান্ডা পানির (বরফ না) সেক উপগর্স নিরাময়ে অনেক উপকারী। রোগ প্রতিরোধে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন সেবন করতে হবে এবং চিকিৎসায় ভিটামিন ইনজেকশন পুশ করতে হবে। মদপান ও ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রিত রাখত হবে। স্নায়ূ ইনজুরি, অবরুদ্ধ (ইনট্রাপমেন্ট) ও সংকোচন (কমপ্রেশন) হলে যথোপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করা বাঞ্ছণীয়। বার্নিং ফুট সিনড্রোম থেকে সুস্থ থাকতে হলে সবাইকে চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকতে হবে।

গাউসিয়া কমিটির মতবিনিময় সভায় আনজুমান এসভিপি মোহাম্মদ মহসিন-

করোনাকালীন মানবতার সেবায় গাউসিয়া কমিটির কর্মীদের আত্মত্যাগ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে

গত ৫ জানুয়ারি নগরীর বহদ্দারহাটস্থ আরবি কনভেনশনসেন্টারে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদ আয়োজিত করেনাকালীন রোগীদের সেবা ও মৃতদের দাফন-কাফন কর্মসুচি ২০২০-এর কার্যক্রমের উপর আয়োজিত পর্যালোচনা ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে আনজুমান সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন বলেন, আধ্যাত্মিক সংগঠন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের কর্মীরা নিজেদের জীবনবাজি রেখে করোনায় আক্রান্তদের সেবা ও মৃতদের দাফন-কাফন-গোসল ও অন্যধর্মাবলম্বীদের যে সহযোগিতা করে আসছেন তা দেশের গন্ডি পেরিয়ে বহিঃর্বিশ্বেও প্রশংসিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী গাউসিয়া কমিটির সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে,একইসাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের যে যুগান্তকারী আহ্বান তা সমুন্নত হয়েছে। তিনি বলেন, গাউসিয়া কমিটির এ সেবা অব্যাহত থাকবে, দেশের যেকোন দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতায় গাউসিয়া কমিটির কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে হবে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় আমাদের আগের চেয়ে আরো বেশী কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, আউলিয়ায়ে কেরামদের প্রধান মিশন হচ্ছে, আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করা। হুজুর কেবলায়ে আলম শাহেনশাহে সিরিকোট আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি আনজুমান ও জামেয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন, গাউসে জামান আল্লামা তৈয়ব গাউসিয়া কমিটি, জশনে জুলস ও মাসিক তরজুমান প্রতিষ্ঠা করেছেন মানবতার কল্যাণে, মানুষকে সঠিক পথ ও মতে পরিচালনার প্রত্যয়ে। তিনি গাউসিয়া কমিটির এ কার্যক্রমে বিত্তবানদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার আহবান জানিয়ে বলেন, গাউসিয়া কমিটির এ কার্যক্রম সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াস্তে, এখানে সেবাপ্রার্থীদের কাছ থেকে কোনরকম ফি বা আর্থিক সহযোগিতা নেয়া হয় নি, ভবিষ্যতেও নেয়া হবে না। গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম মহাসচিব ও করোনাকালীন সেবা ও দাফন-কাফন কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় ও পর্যালোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন, সংগঠনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, বিশেষ অতিথি ছিলেন, কেন্দ্রীয় মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার। করোনাকালীন সেবা ও দাফন-কাফন কার্যক্রমের মিডিয়া সেলের সদস্য এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় ও করোনাকালীন সেবা ও দাফন-কাফন কার্যক্রমের তথ্য কেন্দ্রের প্রধান ও চান্দগাঁও থানা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল্লাহর স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন করোনাকালীন সেবা ও দাফন-কাফন কার্যক্রমের মিডিয়া সেল প্রধান ও দৈনিক পূর্বদেশের সহকারী সম্পাদক অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক এড. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, করোনাকালীন সেবা ও দাফন-কাফন কার্যক্রমের সদস্য আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ইউএই শাখার সাধারণ সম্পাদক জানে আলম, লায়ন ক্লাব অব চিটাগাং ৩১৫-বি এ ডিস্ট্রিক প্রেসিডেন্ট লায়ন আবু নাসের রণি, গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সহসম্পাদক শেখ সালাহ উদ্দিন প্রমূখ। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, থানা ও ওয়ার্ড এ করেনাকালীন কার্যক্রমের সাথে জড়িত সদস্যরা বক্তব্য রাখেন।

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমানের সভাপতিত্বে সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলক্বাদেরীর সঞ্চালনায় জামেয়া মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মদানকারী বীর শহীদদের জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৯৭১ সালে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর প্রবল প্রতিরোধে ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ ও রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত এ বিজয় আমাদের অহংকার। তাই আজকের এ

দিনে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও দেশমাতৃকায় জীবন উৎসর্গকারীদের। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন উপাধ্যক্ষ ড. মাওলানা মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, প্রভাষক মুহাম্মদ আবদুস সবুর, মাওলানা মুহাম্মদ মন্‌জুর রশিদ চৌধুরী প্রমুখ।

উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ছালেকুর রহমান আলক্বাদেরী, মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নুরুল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক, মুহাম্মদ মইনুল ইসলাম, মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ আহমদুল হক, মাওলানা মোহাম্মদ তারেকুল ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুল হক, মুহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম, ক্বারী মুহাম্মদ ইব্রাহিম, হাফেয মুহাম্মদ নুরুচ্ছাফা, মাওলানা মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, হাফেয মুহাম্মদ ফরিদুল আলম, হাফেয মেহাম্মদ আবুল কাশেম, হাফেয মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, মাদরাসার অফিস সেক্রেটারী এস,এম,ওসমান গণিসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল শেষে মুনাজাত পরিচালনা করেন জামেয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আলক্বাদেরী।

সৈয়্যদপুরে তৈয়বিয়া মসজিদের ভিত্তি স্থাপন

সৈয়দপুরে কাদেরিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার নির্ধারিত জায়গায় তৈয়্যবিয়া জামে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২৮ ডিসেম্বর এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, গাউসিয়া কমিটি ও মাদরাসা কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পীরে তরিকত হযরত শাহ সুফি গোলাম জিলানী কাদেরী, আলহাজ্ব গোলজার আহমদ, অধ্যাপক মুহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফী, হাফেজ মাওলানা রিজওয়ান আল কাদেরী, মুহাম্মদ নাদিম আশরাফী, ডাঃ মোহাম্মদ ইসলাম প্রমূখ।

গাউসিয়া কমিটি ও মাদরাসা কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে এডভোকেট হাসনেন ইমাম সোহেল, শাহেদ আলি কাদেরী, আলহাজ্ব আলি ইমাম, আরমান কাদেরী, নাসিম কাদেরী, মাসুদ কাদেরী, মাস্টার শহিদুল হক, ইসা কাদেরী, আব্দুল ওহাব রিজভী, হাফেজ নেসার বখশি, মাওলানা শাহজাদা হোসেন, মাওলানা শেখ খোরশেদ আলম মানিক নূরী, হাফেজ রশিদুল ইসলাম, হাফেজ আব্দুল ওয়াহেদ, মুহাম্মদ বাদশা প্রমূখ।

নারায়নগঞ্জ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদরাসার সভা

নারায়ণগঞ্জ পুরাতন জিমখানাস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদরাসার উদ্যোগে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ নারায়ণগঞ্জ মহানগরের সহযোগিতায় আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল গত ১৬ ডিসেম্বর'২০ বুধবার সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। মাদরাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাওলানা মুহাম্মদ মাঈনুল হাসান ক্বাদেরীর পরিচালনায় কৃষিবিদ আলহাজ্ব মুহাম্মদ নুরুজ্জামান সাহেবের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ আবুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, জাতীয় হিজরী নববর্ষ উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব জনাব মুহাম্মদ ইমরান হোসাইন তুষার। মাদরাসার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোকপাত করেন মাদরাসার সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোবারক হোসেন। পরে মিলাদ, ক্বিয়াম, মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার হিফয বিভাগের এতিম শিক্ষার্থীদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসায় গত ৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মাননীয় প্রশাসক আলহাজ্ব মুহাম্মদ খোরশেদ আলম সুজন এর পক্ষে জামেয়ার হিফয বিভাগের ৪৮ জন গরীব/এতিম শিক্ষার্থীর মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র বিতরণ করেন অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ মাওলানা ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলক্বাদেরী, ইংরেজি প্রভাষক জনাব মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, আরবি প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, হাফেয মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন, হাফেয মুহাম্মদ মুছা, হাফেয মুহাম্মদ আবুল কাশেম, হাফেয মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ, অফিস সেক্রেটারী এস, এম, ওসমান গনি, আইসিটি কর্মকর্তা মুহাম্মদ আকতারুল আলম সোহেল প্রমূখ।

রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জে জামে মসজিদ উদ্বোধন

রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ বিশালপুর আমিন পাড়া গ্রামে আমিন পাড়া জামে মসজিদ গত ২৫ ডিসেম্বর শুভ উদ্বোধন করা হয়। এতে উদ্বোধক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী শাখার সাধারণ সম্পাদক ময়নামতি সার্ভে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের ট্রেইনার আলহাজ্ব মুহাম্মদ ওমর ফারুক তালুকদার। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব মুহাম্মদ মমতাজ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আতাউল গণি মাসুদ। বক্তব্য রাখেন নাচোল মুর্শিদা দাখিল মাদরাসার সহ সুপার আলহাজ্ব মাওলানা লুৎফর রহমান, রাজবাড়ী জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আলমগীর হোছাইন। সভাপতিত্ব করেন সার্ভেয়ার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গাউসিয়া কমিটি বেতবুনিয়া শাখার অর্থ সম্পাদক আবু হাসান খান।

বিভিন্নস্থানে ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল

হবিগঞ্জ জেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে উরসে গাউছুল আজম মাহফিল গত ৯ ডিসেম্বর আলহাজ্ব চৌধুরী আব্দুল হাই এডভোকেট এর সভাপতিত্বে গাউছিয়া একাডেমি ও দাখিল মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যক্ষ গোলাম সরওয়ার আলম ও কাজী ছাইফুল মোস্তফার যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিউর রহমান আলক্বাদেরী, বিশেষ আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোসাহের উদ্দিন বখতিয়ার। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন আল্লামা শাহ জালাল আহমদ আখঞ্জী, মাওলানা গোলাম মোস্তফা নবীনগরী, মাওলানা আলী মুহাম্মদ চৌধুরী, মাওলানা সোলায়মান খাঁন রাব্বানী, মাওলানা শহিদুল ইসলাম, মুফতি আশরাফুল ওয়াদুদ, মুফতি মুজিবুর রহমান আল ক্বাদরী, মাওলানা ফরাস উদ্দিন, মাওলানা আবু তৈয়্যব মোজাহেদী প্রমূখ।

রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে পবিত্র গেয়ারভী শরিফ ও মিলাদ মাহফিল শহরের নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়ায় গত ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গাউসিয়া কমিটি রংপুর জেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল কাদির খোকন। উপস্থিত ছিলেন জেলা গাউসিয়া কমিটির সম্পাদক আব্দুল মান্নান শরীফ বাবলু, অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জিয়াত পুকুর মাযার শরীফ সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা আবুল কাসেম, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আইয়ূব আলী আনসারি। বক্তব্য রাখেন রংপুর মিঠাপুকুর কাদেরিয়া তাহেরিয়া রাবেয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা মোহাম্মদ সাহিদার রহমান। উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান, আলহাজ্ব নিজামুদ্দিন, হাসান আলী, মোস্তাক আহমেদ, মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, সাইফুল ইসলাম, নাছির উদ্দীন। মুনাজাত করেন মাওলানা মোহাম্মদ আইয়ূব আল।

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে ফাতেহা ইয়াজদাহুম মাহফিল গত ১২ ডিসেম্বর মুহাম্মদ আইয়ুব এর সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় হাজী আবদুল আলী জামে মসিজদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান, মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া, মুহাম্মদ আবদুল খালেক, আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী, হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগর, মুহাম্মদ মফিজুর রহমান, মুহাম্মদ সাহাব উদ্দিন, কে.এম নুর উদ্দিন চৌধুরী, কামাল আহমদ মজু, মুহাম্মদ আবদুল হালিম, মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, শেখ আহমদ ছাফা, আ.ফ.ম মঈনউদ্দীন, মুহাম্মদ ইলিয়াছ খোকন, মুহাম্মদ হোসেন, মুহাম্মদ ইলিয়াছ আমান প্রমুখ।

উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে মাসিক সভা ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল গত ১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। দাওয়াতে খায়র পরিচালনা করেন মাওলানা গিয়াস উদ্দিন আলকাদেরী। উপস্থিত ৯নং ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক

সম্পাদক নাঈমুল হাসান তানভীর, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সহ-অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক, নোয়াপাড়া ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান হৃদয়, দপ্তর সম্পাদক জামিলুর রহমান সাকিব, গোলপাহাড় ইউনিটের সভাপতি মুহাম্মদ আলী হোসেন, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ সোহেল, কৈবল্যধাম ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক ডা. জসিম উদ্দিন, ইস্পাহানী ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু নাছের, নাজমুল হোসেন তাওহিদ, কামরুল, সাদরিব প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি আবদুল আলী নগর ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানাধীন আবদুল আলী নগর ইউনিট শাখার উদ্যোগে ফাতেহা ইয়াজদাহুম মাহফিল গত ১৮ ডিসেম্বর সংগঠনের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ মুসলিম মিয়ার সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। তকরীর পেশ করেন মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম আলকাদেরী। প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন। প্রধান বক্তা ছিলেন দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগর, শেখ আহমদ ছফা, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ নাঈমুল হাসান তানভীর, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন।

গাউসিয়া কমিটি লতিফপুর ওয়ার্ড

গাউছিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানাধীন লতিফপুর ওয়ার্ড আওতাধীন আহম্মদ উল্ল্যাহ কাজী বাড়ী ইউনিটের উদ্যোগে পবিত্র ফাতেহা-এ-ইয়াজদাহুম মাহফিল গত ১০ ডিসেম্বর, আহম্মদ উল্ল্যাহ কাজী বাড়ী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কাজী তৌহিদ আজম সাজ্জাদ এর সঞ্চালনায় মাওলানা দিদারুল ইসলাম কাদেরীর সভাপতিত্বে বাদে মাগরিব হতে খতমে গাউছিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আল্লামা মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রজভী ও প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা আবু নওশদ নঈমী আশরাফী। বিশেষ বক্তা ছিলেন মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মফিজুর রহমান, মোহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, কাজী মুহাম্মদ ফেরদৌস শাকিল, মুহাম্মদ আলী, কাজী মঈনুল আজম মারুফ, সৈয়দ মুহাম্মদ মোমেন, মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন রুবেল, কাজী মুহাম্মদ তৈয়ব আজম প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানার আওতাধীন লতিফপুর ওয়ার্ডের উদ্যোগে পবিত্র ফাতেহা-এ-ইয়াজদাহুম ও দাওয়াতে খায়ের মাহফিল গত ১৬ ডিসেম্বর, পাকা রাস্তার মাথা মদনী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান মুয়াল্লেম ছিলেন ড. আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী। বিশেষ মুয়াল্লেম ছিলেন মদনী জামে মসজিদের খতিব পীরজাদা সৈয়দ আবু নওশাদ নঈমী আশরাফী (মা.জি.আ.), হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল হালিম। মুহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ডের সভাপতি মোহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া। মাওলানা মুজিব উদ্দিন কাদেরী, হাফেজ মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন।

লতিফপুর রহমান বাড়ী ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, লতিফপুর ওয়ার্ড আওতাধীন রহমান বাড়ী মসজিদে গাউসুল আজম ইউনিটের উদ্যোগে ফাতেহা-এ-ইয়াজদাহুম মাহফিল গত ১৭ ডিসেম্বর, রহমান বাড়ী মসজিদে গাউসুল আজম মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম এর সঞ্চালনায় মাওলানা আরিফ মুহাম্মদ মহিউদ্দীন এতে সভাপতিত্ব করেন। এতে মেহমান ছিলেন মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মোকারম বারী (মা.জি.আ.)। প্রধান আলোচক ছিলেন হযরতুল আল্লামা আব্দুল হালিম আল কাদেরী। বিশেষ মেহমান ছিলেন গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ, পাহাড়তলী থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন ও গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ, লতিফপুর ওয়ার্ডের সভাপতি মোহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া। বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন রুবেল, মুহাম্মদ বাহাদুর, মুহাম্মদ মারুফ, মুহাম্মদ আবদুল মোমিন, হাফেজ মুহাম্মদ আরিফ।

আব্বাস মাঝি বাড়ী ইউনিট

গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ, লতিফপুর ওয়ার্ডের আওতাধীন আব্বাস মাঝির বাড়ী ইউনিটের উদ্যোগে ফাতেহা-এ ইয়াজদাহুম মাহফিল গত ১৪ ডিসেম্বর, ইউনিট সভাপতি মোহাম্মদ রবিউল হোসেনের সঞ্চালনায় ও ০৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন মেম্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্বোধক ছিলেন মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মুর্শেদুল

আলম, বিশেষ অতিথি ছিলেন হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রিস কাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন, মোহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া ।

গাউসিয়া কমিটি ওয়াজের আলী রোড ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৯নং ওয়ার্ড শাখার আওতাধীন ওয়াজের আলী রোড ইউনিট শাখার উদ্যোগে গত ১ জানুয়ারী আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর এবাদত খানায় ইউনিট সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ হামিদ এর সভাপতিত্বে মাসিক খতমে গাউসিয়া শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ওয়াজের আলী রোড ইউনিট এর উপদেষ্টা যথাক্রমে আলহাজ্ব মোহাম্মদ ছিদ্দিক, আলহাজ্ব ছাবের আহম্মদ জাহাঙ্গীর, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন বিটু, শেখ রফিউদ্দিন আহমেদ মিয়া, আলহাজ্ব আজিম উদ্দিন, মোহাম্মদ বশির ও সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুল, দাওয়াতে খাইর সম্পাদক হাফেজ মোহাম্মদ জসিম, ইউনিট সদস্য মোহাম্মদ এরশাদ, মোহাম্মদ গিয়াস প্রমূখ ।মাহফিলে আলোচক ছিলেন আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর এবাদতখানার পেশ ইমাম আলহাজ্ব মোহাম্মদ সৈয়দ আনসারী ।

পটিয়া লাখেরা ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পশ্চিম পটিয়া লাখেরা ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে ফাতেহা ইয়াজদাহুম ও অভিষেক গত ১৬ ডিসেম্বর শাখার সভাপতি সুরা আহমদ সারাং-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিম পটিয়া থানা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ এয়াকুব আলী, প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি ৪নং কোলাগাউ ইউনিয়নের সভাপতি মুহাম্মদ আলী আবছার, উদ্বোধক ছিলেন ৪নং লাখেরা শাখার প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ আজিজুর রহমান মিয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন কোলাগাও ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা মাস্টার জালাল আহমদ, সহ সভাপতি মাস্টার মুহাম্মদ মনসুর আলম চৌধুরী, কোলাগাও ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন, বিশেষ আলোচক ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, ইউপি সদস্য মুহাম্মদ রবিউল আলম মেম্বার। পশ্চিম পটিয়া শাখার সহ সভাপতি মুহাম্মদ হারুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল হারুন, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ শফিউল আজম বাদশা, সহ প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সওদাগর ।

বেতাগী ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পশ্চিম বেতাগী ১নং ওয়ার্ড শাখার ব্যবস্থাপনায় ১৮তম গাউসুল আজম জিলানী কনফারেন্স গত ১৬ ডিসেম্বর পশ্চিম বেতাগী হযরত মালেক শাহ্ রহ. মাজার সংলগ্ন ময়দানে দরবার-এ বেতাগী আস্তানা শরীফের শাহযাদা মাওলানা গোলামুর রহমান (আশরফ শাহ)'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যক্ষ মাওলানা ইলিয়াছ নুরী, মাওলানা হাবিবুর রহমান ফারুক, মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান আলী রজভী, মাওলানা মুহাম্মদ আরিফুর রহমান রাশেদ, মাওলানা আহমদ করিম নঈমি, মাওলানা আবু জাফর, মাওলানা ছৈয়দ দ্বীন মুহাম্মদ, মাওলানা জকির হোসেন ও নুর মুহাম্মদ মেম্বার। উপস্থপনায় ছিলেন মুহাম্মদ আরিফুর রহমান রিয়াদ ও মোফাচ্ছেল চৌধুরী ।

গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক তৎরপরতা

ফটিকছড়ি (উত্তর উপজেলা)

দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ফটিকছড়ি উপজেলা উত্তর শাখার প্রতিনিধি সম্মেলন গত ২৬ ডিসেম্বর সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবু তাহের আলকাদেরীর সভাপতিত্বে, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাছউদ কাদেরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাষ্টার মুহাম্মদ ওসমান খাঁ এর যৌথ সঞ্চালনায় একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মদিনা মুনওয়ারা শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল ইসলাম ভুঁইয়া। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সিনিয়র-সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন হোসাইন হায়দরী। এতে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন, গাউসিয়া

কমিটি বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উত্তর জেলার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ নুরুল আজিম, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল আহসান চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক মাষ্টার মুহাম্মদ খোরশেদুল আলম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ আহসান হাবীব চৌধুরী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সদস্য অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন। আরো উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক জনাব মুহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম জসিম, মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআত বাংলাদেশ ফটিকছড়ি পৌরসভার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুর রহমান ফারুকী, মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

এতে সর্ব সম্মতিক্রমে নিমোক্তদের কমিটি ঘোষণা করা হয়। আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের আলকাদেরী- সভাপতি, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কাশেম (কাউন্সিলর)- সিঃ সহ- সভাপতি, হাফেজ সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল লতিফ চাটগামী- সহ- সভাপতি, আলহাজ্ব মাও. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাছউদ কাদেরী- সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ ইদ্রিস হায়দার- যুগ্ম সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ আলিম উদ্দিন কাদেরী- সহ-সাধারণ সম্পাদক, মাষ্টার মুহাম্মদ ওসমান খাঁ- সাংগঠনিক সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ আলী ফারুকী- সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজুল আলম আলকাদেরী- সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ মুহি উদ্দিন চৌধুরী- অর্থ-সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন মামুন-দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ নূর উদ্দিন কাদেরী- সহ-দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন সিদ্দিকী- সহ-দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ আলমগীর- সহ-দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, মুহাম্মদ রবিউল মাহমুদ রেজভী- সহ-দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, মাস্টার মুহাম্মদ আবদুল হালিম-দপ্তর সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর মিয়া- সহ-দপ্তর সম্পাদক, মাস্টার মুহাম্মদ শাহজাহান- প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, মাস্টার মুহাম্মদ আমানুল হক- শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক, মাওলানা ইউছুফ মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন শাহ্- সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুজিবুল আলম বাবুল- সমাজ সেবা সম্পাদক, আলহাজ্ব জাকির আহমদ মিস্ত্রী- নির্বাহী সদস্য, মাওলানা মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল হোসেন, মুহাম্মদ মঈনুল আলম চৌধুরী, মুহাম্মদ খায়রুল আমিন, মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুর রহমান ফারুকী, মুহাম্মদ বেলাল উদ্দিন (কাউন্সিলর), মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস ছবুর নঈমী, মাওলানা মুহাম্মদ মহি উদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন কাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা নজরুল, মাওলানা মুহাম্মদ জেবল হোসাইন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহাবুবুল আলম, মুহাম্মদ আবুল কালাম বয়ানি, মুহাম্মদ এজাহার আলম, মাওলানা মুহাম্মদ আজগর আলী তাহেরী, মুহাম্মদ দুলাল প্রমুখ। সবশেষে আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ তৈয়্যব খাঁন আলকাদেরী সকলের জন্য দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন।

বৈরাগ ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা আওতাধীন বৈরাগ ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন বৈরাগ জামে মসজিদে সংগঠনের সভাপতি ফরিদ উদ্দীন খাঁন মিল্টনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ্ মাস্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন দক্ষিণ জেলার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ১নং বৈরাগ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ সোলাইমান। নির্বাচন কমিশনার ছিলেন গাউসিয়া কমিটি আনোয়ারা উপজেলা শাখার সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করিম আনোয়ারী, নির্বাচন কমিশনার সদস্য উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এম. মনির আহমদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব নাজিম উদ্দিন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব ফজলুল কাদের মাস্টার, হাজী বজল আহমদ, এস.এম. আব্বাস উদ্দিন, মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, কেরামত আলী মেম্বার, মুহাম্মদ এমদাদুল হক বকুল, মুহাম্মদ আবদুল আজিজ প্রমুখ। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ফরিদ উদ্দিন খান মিলটনকে সভাপতি, আব্দুল জব্বার সিনিয়র সহ সভাপতি, মুহাম্মদ আবদুল মালেক মাস্টার, মনির আহমদ, মুহাম্মদ আবু জাফরকে সহ সভাপতি, হাফেজ মুহাম্মদ বেলাল সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা হাছান আলী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ আবদুল হাকীম, মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, মুহাম্মদ ইউনুচ সহ সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ শফিউল আজম সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ সাদ্দাম সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, হাজী শফিক আহমদ অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মদ ইয়াকুব সহ অর্থ সম্পাদক, মাওলানা আবদুল

আউয়াল, মাওলানা লোকমান হাকিমী, রায়হান আহমদকে দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, মুহাম্মদ আব্দুস সালাম প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, মুহাম্মদ ফজলুল করিম সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, মুহাম্মদ আলমগীর শাহ্ দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ হানিফ সহ দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ আব্দুল আলীম তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, মুহাম্মদ হানিফ তালুকদার সহ তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, কাজী আবদুল আল মাহমুদ জনি শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পাদক, মুহাম্মদ আবু তাহের সমাজসেবা সম্পাদক, হাজী মুহাম্মদ নুরুল আলম সহ সমাজসেবা সম্পাদক, মুহাম্মদ আলী বক্স মহিলা বিষয়ক সম্পাদিক, মুহাম্মদ কামালকে সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদ ও ১১জন সদস্যসহ চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট কমিঠি গঠন করা হয়।

চাতরী ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা আওতাধীন ৮নং চাতরী ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সম্প্রতি মুহাম্মদ আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ্ মাস্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, নির্বাচন কমিশনার ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা শাখার সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করিম আনোয়ারী, নির্বাচন কমিশন সদস্য ছিলেন উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এম. মনির আহমদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজী বজল আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী, উপস্থিত ছিলেন এস.এম. আব্বাস, মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিছ আনোয়ারী, মুহাম্মদ এমদাদুল হক বকুল, হাজী মুহাম্মদ আবদুর রহিম প্রমুখ।

সম্মেলনে মুহাম্মদ মনির উদ্দিনকে প্রধান উপদেষ্টা, মুহাম্মদ আবদুর রহমান সভাপতি, এস.এম. জয়নাল আবেদীন খোকন সিনিয়র সহ সভাপতি, কাজী মুহাম্মদ সাইফুল আনোয়ার, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম নুরু, মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, মুহাম্মদ পারভেজ উদ্দিনকে সহ সভাপতি, মুহাম্মদ এমদাদুল হক বকুলকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ হাবীব যুগ্ম সম্পাদক, মুহাম্মদ হাসান, মুহাম্মদ তৌহিদুল আলম, মুহাম্মদ এয়াকুব, মুহাম্মদ শহীদুল ইসলামকে সহ সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন খাঁন চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম, মুহাম্মদ নুরুল মনছুর সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ বেলাল অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মদ শেখ সেলিম মুন্না সহ অর্থ সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুল হক, মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, হাফেজ মুহাম্মদ নুরুন্নবী চৌধুরীকে দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, মুহাম্মদ আরফাত উদ্দিন দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ সিহাব সহ দপ্তর সম্পাদক, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, মুহাম্মদ আবদুল হালিম সমাজসেবা সম্পাদক, মুহাম্মদ এনামুল হক রিয়াদ, সহ সমাজসেবা সম্পাদক, মুহাম্মদ সাব্বির হোসাইন শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, মুহাম্মদ রবিউল হক রিজভী সহ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, মুহাম্মদ আরিফুল হক রিমন তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, মুহাম্মদ সাঈদ খান রিকন সহ তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, মুহাম্মদ শাহ্ আলম মিয়া মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, মুহাম্মদ ইউছুফ সওদাগর সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, কাজী রোবায়েদ আহমদ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেনকে সহ সাহিত্য সম্পাদক করে ১৫ জন সদস্যসহ ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

সাতকানিয়া পুরানগড় ইউনিয়ন শাখা গঠিত

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সাতকানিয়া উপজেলাধীন পুরানগড় ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল পুরানগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ মাস্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহ সভাপতি মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা সভাপতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান, বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুন নূর আনসারী, মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান সেলিম। উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলামকে সভাপতি, মুহাম্মদ ছাইদুল আমিন সিনিয়র সহ সভাপতি, মাওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ আবরার উল্লাহ্ সমরকন্দী সাংগঠনিক সম্পাদক, হাফেজ মুহাম্মদ আবিদুর রহমান দাওয়াতে খায়র সম্পাদক ও মুহাম্মদ ফরিদুল আলমকে অর্থ সম্পাদক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সাতকানিয়া ধর্মপুর ইউনিয়ন শাখা গঠিত

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সাতকানিয়া উপজেলাধীন ধর্মপুর ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল গত ৮ জানুয়ারি গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া জিন্নাত আরা সুন্নিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি রেজভির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সহ সভাপতি মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, প্রধান বক্তা ছিলেন দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মনসুর, বিশেষ অতিথি ছিলেন সাতকানিয়া উপজেলা সভাপতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান, আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইমরান, মাওলানা আবদুন নুর আনসারি, মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন, শাহাদাত হোসাইন, আখতারুজ্জামান সেলিম, মাওলানা মুহাম্মদ ইফতিখারুল ইসলাম, মাওলানা মুহাম্মদ মাইনুদ্দিন কাদেরী। বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ফোরকান আহমদ। উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি রেজভি সভাপতি, ফোরকান আহমদ সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা ইফতিখারুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ নুরুল কবির বাবুকে অর্থ সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। পরিশেষে মিলাদ-কিয়াম ও মুনাজাতের মাধ্যমে মাহফিল সমাপ্ত হয়।

বাজালিয়া ইউনিয়ন শাখা গঠিত

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সাতকানিয়া উপজেলার আওতাধিন বাজালিয়া ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন গত ১৬ ডিসেম্বর বোমাংহাটস্থ সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সভাপতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ্ মাস্টার, প্রধান বক্তা ছিলেন দক্ষিণ জেলার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবদুন নুর আনসারী, মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান সেলিম, মুহাম্মদ ইফতিখারুল ইসলাম, মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, ওয়ার্ড প্রতিনিধির মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবদুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ, এরশাদ হোসেন হিরু, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল নোমান। উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমানকে সভাপতি, মুহাম্মদ ফোরকান সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ আবুল কাসেম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ মিজান সহ সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ এমানুল হক সাংগঠনিক সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কাশেম দাওয়াতে খায়র সম্পাদক, জাহাঙ্গির আলম অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মদ সুলায়মান বাশিকে সহ অর্থ সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি কমিঠি গঠন করা হয়।

শোক সংবাদ

আলহাজ্ব মনির আহমদের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

পটিয়াস্থ খানকা-এ কাদেরিয়া ছৈয়দিয়া তৈয়্যবিয়া ব্যবস্থাপনায় ফাতিহা এয়াজদাহুম ও আলহাজ্ব মনির আহমদ সওদাগরের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল গত ১১ ডিসেম্বর আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। প্রধান বক্তা ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার, মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, সহ সভাপতি আলহাজ্ব নেজাবত আলী (বাবুল), দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ্ মাস্টার, যুগ্ম সম্পাদক শেখ সালাউদ্দিন, মাওলানা নুরুল আবছার আলকাদেরী, পটিয়া উপজেলা সভাপতি মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী (শামীম), ডা. আবু সৈয়দ, হাজী শহিদুল ইসলাম, পৌরসভা সভাপতি কাজী আবু মহসিন, সম্পাদক হাজী সাইদুল ইসলাম, কাজী দিদারুল আলম, আবদুল কাদের, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আলকাদেরী। প্রধান অতিথি মরহুম আলহাজ্ব মনির আহমদ সওদাগরের সুযোগ্যপুত্র মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনকে খানকা পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন।

সৈয়দ আহমদ বাবুলের সহধর্মিণীর ইন্তেকাল

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ফাইন্যান্স সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হকের পুত্রবধু ও আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ বাবুলের স্ত্রী গত ২৬ ডিসেম্বর বাকলিয়া মিয়াখাঁন নগরস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। পরদিন ২৭ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় মরহুমার নিজ বাসভবনের সম্মুখে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

মরহুমার ইন্তেকালে আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, এ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার গভীর শোক প্রকাশ, সমবেদনা ও মাগফিরাত কামনা করেন।

শাহেদুল করিমের ইন্তেকাল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত ইউএই কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক আলহাজ্ব তৌহিদুল করিমের বড়ভাই শাহেদুল করিম (৬০) চট্টগ্রাম পার্কভিউ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-রাজেউন) মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখেযান। মরহুমের নামাজের জানাযা ২০ ডিসেম্বর, ১১টায় রাউজান গহিরা খোন্দকারবাড়ী জামে মসজিদ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের ইন্তেকালে আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, ইউএই কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ আইয়ুব, সাধারণ সম্পাদক জানে আলম, দুবাই আল- আবির শাখার সভাপতি মাওলানা আবু জাফর, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

জালাল উদ্দিন ফারুকীর মায়ের ইন্তেকাল

মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী)'র সিনিয়র আরবি প্রভাষক আলহাজ্ব মুফতি মাওানা এ.এস.এম. জালাল উদ্দিন ফারুকীর মায়ের ইন্তেকালে মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ মনজুর আলম মনজু, অধ্যক্ষ-সচিব মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি, পরিচালনা পর্ষদ, কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন। শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

প্রকাশিত বই সংগ্রহ করুন- পড়ুন, ঈমান-আক্বীদা সম্পর্কে জানুন

আনজুমান প্রকাশনার পুনঃনির্ধারিত মূল্য তালিকা

ক্রমিক	নাম	বই'র পৃষ্ঠা	পূর্ব মূল্য	বর্তমান মূল্য
০১	তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত	৭২	২৫/-	২৫/-
০২	মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (আরবী) প্রতি খণ্ড	৯৪০	৫৭০/-	৪০০/-
০৩	মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (বাংলা অনুবাদ-১৬) প্রতি পারা	১৪৬	১৩০/-	১১০/-
০৪	শাজরা শরীফ	৮২	৫০/-	২৫/-
০৫	গাউসিয়া তারবিয়াতী নেসাব	৭০০	৩৮০/-	২০০/-
০৬	যুগ জিজ্ঞাসা	৩৪০	২৫০/-	১৭০/-
০৭	শানে রিসালত	১৮২	১৫০/-	১০০/-
০৮	দরসে হাদীস	১৪৭	১০০/-	৮০/-
০৯	সহীহ্ নামায শিক্ষা	৯৮	৪০/-	৪০/-
১০	নজরে শরীয়ত	৮০	৬০/-	৪০/-
১১	আওরাদে কাদেরিয়া	৫৮৯	২৫০/-	২০০/-
১২	গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কী ও কেন?	২৪		১০/-
১৩	মিলাদে সুয়ূতী: মিলাদ ক্বিয়ামের দলিল	১১২	১২০/-	৮০/-
১৪	নূরানী তাক্বরীর	১৬৮	১৫০/-	১০০/-
১৫	ইন্তেকালের পর জীবিত হলেন যারা	৮০	৫০/-	৫০/-
১৬	হায়াতুল আম্বিয়া (আ.): ইমাম বায়হাক্বী (রাহ.)	৩২	২৫/-	২৫/-
১৭	আহলে বায়তের ফযিলত	৮০	৫০/-	৫০/-
১৮	হাযির-নাযির	৬৪	৪০/-	৩০/-
১৯	এরশাদাতে আ'লা হযরত	৯১	৬০/-	৫০/-
২০	নবীগণ সশরীরে জীবিত	৫৬	৪০/-	৩০/-
২১	ওযীফা-ই গাউসিয়া	২৫৮	১৭০/-	১৩০/-
২২	ছোটদের বড়পীর গাউসে পাক (রাদ্বি.)	৩২	৪০/-	৪০/-
২৩	রিসালাহ্-ই নূর	৮০	৬০/-	৫০/-
২৪	শবে বরাত	১২৮	১২০/-	৮০/-
২৫	দা'ওয়াত	২৪০	১৫০/-	১০০/-
২৬	রহমতে আলম (দ.)	২৪	২৫/-	২৫/-
২৭	হযরত আমিরে মু'আবিয়া (রাদ্বি.)	৭২	৫০/-	৪০/-
২৮	সত্য সমাগত বাতিল অপসৃত	৩৮৬	২৫০/-	১৮০/-
২৯	চল্লিশ হাদীস	৫৬	৫০/-	৩০/-
৩০	দো'আ ও মুনাজাত	৮০	৮০/-	৫০/-
৩১	ইজতিমার তোহ্ফা	৩২		২০/-
৩২	আক্বাইদ ও মাসায়েল	২০৮	৬০/-	৬০/-
৩৩	ইখলাস	৯৬	৮০/-	৫০/-

প্রকাশনায়

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট (প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ)
৩২১, দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫,
www.anjumantrust.org E-mail.monthlytarjuman@gmail.com,monthlytarjuman@yahoo.com,